দাম : বারো টাকা

প্রেমহীন প্রেমদিবস পালনে মত্ত ওয়াই জেনারেশন — পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম প্রবহমান সভ্যতা — পৃঃ ১৩

৭৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।। ১ ফাল্গুন - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

ঠুনকো সম্পর্কের প্রদর্শন 'ভ্যালেন্টাইনস্ ডে' ভারতীয় নয়

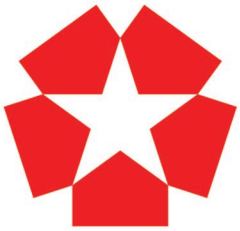

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®

CENTURYLAMINATES®

CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM®

CENTURYMDF®

CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৪ ফেব্রুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বিজেপির অ্যাসিড টেস্ট উত্তরপ্রদেশে আর মমতার 'পাখির চোখ' রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

বিয়ের মাসেই মধুচন্দ্রিমা শেষ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বড়ো জয় একান্ত প্রয়োজন কেন? □ গিলেস ভার্নিয়ার্স □ ৮

প্রার্থী তালিকা নিয়ে শাসকদলের দ্বন্দ্ব ঠিক কোথায়? □ বিশ্বামিত্র □ ১০

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১১

ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম প্রবহমান সভ্যতা □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৩

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২২— এক নতুন দিশারি □ রামানুজ গোস্বামী □ ১৬

নবরূপে রামমন্দির, নবরূপে অযোধ্যা নগরী □ করুণা প্রকাশ □ ১৭

ঠুনকো সম্পর্কের প্রদর্শন ভ্যালেন্টাইন ডে □ অনামিকা দে □ ২৩

বাঙ্গালির প্রেম দিবস এবং প্রেম-ভাবনা □ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী □ ২৪

প্রেমহীন প্রেমদিবস পালনে মত্ত ওয়াই জেনারেশন □ সুকল্প চৌধুরী □ ২৬

ফাল্গুনের প্রথম দিনটি হোক ভারতের প্রেমদিবস □ কল্যাণ গৌতম □ ২৮

বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়? □ নিখিল চিত্রকর □ ৩০

বিশ্বের সব শিবভক্ত শিবগোত্রের অন্তর্ভুক্ত □ মহন্ত যোগী সুন্দর নাথ মহারাজ □ ৩১

গুণী চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন □ দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ৩৪

সাক্ষাৎকার : পশ্চিমি হাওয়ায় মেতেছে বাঙ্গালি □ ৩৫

স্বাধীন ভারতে মহাকাশ গবেষণা : এক আলোকদিশা □ প্রিয়াঙ্কা ঘোষ □ ৩৬

ভারতের মানচিত্র থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে □ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৩৭

সব জেনেশুনে তবেই মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখবেন □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ খেলার জগৎ : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২১ ফেব্রুয়ারি
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ ফেব্রুয়ারি
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাহুর গ্রাসে কলেজ স্ট্রিট

২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও ভাষা দিবস নিয়ে হইচই কিছু কম হয় না। অথচ বাংলা প্রকাশনার প্রাণকেন্দ্র কলেজ স্ট্রিট বহুদিন ধরেই মরণাপন্ন। বাঙ্গালি পাঠকের বই পড়ার অভ্যেস অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভালো লেখকের অভাব এবং অবাধ পাইরেসি। রাজ্য সরকার এব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা মরণাপন্ন কলেজ স্ট্রিট নিয়ে। লিখবেন সুজিত রায়, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from -

A Well Wisher

সম্পাদকীয়

এই হুজুগও একদিন বন্ধ হইবে

ভারতবর্ষ প্রেমের দেশ। প্রেমেরই আর এক নাম ভালোবাসা। এই দেশের মানুষ দেব-দেবীকেও মনুষ্যজ্ঞানে ভালোবাসিয়াছে। মানব-মানবীর প্রেমের মতোই সেই ভালোবাসা। যাহাকে তাহারা পূজা নাম দিয়াছে। নর-নারী অন্তরের ভালোবাসা নিবেদন করিয়া প্রিয়জনকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রেমের বহুল বর্ণনা রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রেমভূমিতে নর-নারী হয়ে যায় দেব-দেবী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনাটি অতি সুন্দর — ' দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা! দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'। ইহাই হইল ভারতীয় প্রেমভাবনার মূল কথা। এই প্রেম একান্তভাবে আপনার। এ প্রেমের স্ফুরণ শুধু মনোজগতে। ইহার বহিঃপ্রকাশ নাই, প্রদর্শন নাই। ইহা এক পবিত্র আন্তরসত্তা। এই দেশে আবহমান কাল হইতে রাইকিশোরী-কালাচাঁদ, চণ্ডীদাস-রজকিনী, হর-পার্বতী, আরও কতশত প্রেমিক-প্রেমিকা মানব মনে পবিত্র প্রেমের জাল বুনিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কালিদাস, ভবভূতি, বিদ্যাপতি, জয়দেব আর প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কে না জানে? ইহাদের লইয়া কত পদাবলী, কত কবিতা, কত উপন্যাস রচিত হইয়া নর-নারীর মনকে প্রেমরসে সিক্ত করিয়াছে। এই প্রেমের হাটে কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন? তাহাও আবার বসন্তোৎসবের প্রাকমুহূর্তে? ভারতবর্ষের হৃদয় কি প্রেমহীন মরুভূতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে? ভারতীয় জীবনে তো একাধিক প্রেমের আইকন রহিয়াছেন! এই নববাসন্তিক পরিমণ্ডলে অশোক-পলাশের আগুনে কেন আমদানি করিতে হইল ইতিহাসের আস্তাকুড় হইতে তুলিয়া সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে? আসলে বিশ্বায়নের এই যুগে চোখ পড়িয়াছে ভারতের বাজারের উপরে। তাই পরিকল্পনা করিয়া গ্লোবালাজেশনের সুনামিতে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায় হইতে তুলিয়া আনিয়া কমার্সিয়াল কনসেপ্ট রূপে তাহাকে প্রেমের দেবতা হিসাবে প্রোজেক্ট করা হইয়াছে। তাহাদের টার্গেট হইল টিন এজার ও যুব প্রজন্ম। গ্লোবালাইজেশনের মূল চালিকাশক্তি তো বাজার অর্থনীতি। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্যের এই প্রেমদিবসে কত কোটি টাকার গোলাপ ও গ্রিটিং কার্ড বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাবই বলিয়া দিবে প্রকাশ্য প্রেম প্রদর্শনের মাতামাতি কতটা বাড়িয়াছে।

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে বহু রকমের কথা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একট হইল, পশ্চিমের বহু দেশে এক সময় সৈনিকদের প্রেমে জড়িয়ে পড়া বা বিবাহ করা নিষদ্ধ ছিল। কারণ প্রেমে পড়িলে বা বিবাহ করিলে নাকি যোদ্ধাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইবে। তাই রাজারা যোদ্ধাদের প্রেম করা বা বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই রাজ আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। তিনি রাজার নজর এড়িয়ে নাকি কয়েক জন সৈনিকের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হয়। রাজরোষের শিকার হইয়া শূলে প্রাণ দিতে হইয়াছিল ভ্যালেন্টাইনকে। এই ইতিহাস মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। নেট দুনিয়ার কৌশল ও মিডিয়ার দৌলতে হিরো বানানো হইয়াছে তামাদি পড়িয়া যাওয়া এই খ্রিস্টীয় সাধুকে। এখন সমগ্র বিশ্বে প্রেমের ইজারা লইয়া বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিতেছেন এই সাধু। তথাকথিত প্রেমিক-প্রেমিকারা এখন প্রকাশ্যে প্রোপোজ করিতে শুরু করিয়াছে ভ্যালেন্টাইনের নাম লইয়া।

বিশেষ একটি দিনে প্রকাশ্যে প্রেম প্রদর্শনের এই বেলাল্লাপনায় কেহ কেহ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন— যুব প্রজন্ম কি গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে? ইহা একভাবে সঙ্গত চিন্তা। ভাবিবার বিষয় হইল, স্বাধীনতার এতগুলি বৎসরে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কোনো পাঠক্রম ছিল না যাহার ফলে পড়ুয়ারা জীবনে চলার পথে সঠিক দিশা পাইতে পারে। অপমান ও নিন্দার বোধ জন্মিতে পারে। স্বভাবতই একটি বৃহৎ কালখণ্ডে দেশের যুব প্রজন্ম প্রায় স্বাভিমান শূন্য অবস্থায় বড়ো হইয়াছে। তাহারই বিষময় ফল দেশের বিশেষ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনায় পরিলক্ষিত হইতেছে। শুধু শঙ্কিত হইলেই এই অপসংস্কৃতি হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। দেশের যুব প্রজন্মকে ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, পরম্পরা ও সঠিক ইতিহাস পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বহু পরীক্ষানিরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাহা এত ঠুনকো নহে যে ভ্যালেন্টাইনের ধাক্কায় তাহার ভিত নড়িয়া যাইবে। সুখের বিষয়,দেশের নূতন শিক্ষানীতিতে ইতিহাসের পাঠক্রমে পড়ুয়াদের স্বাভিমান জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার কাজও শুরু হইয়াছে। আশা করা যায়, এই ভ্যালেন্টাইনের হুজুগও একদিন স্তিমিত হইয়া পড়িবে।

সুভাষিতম্

অভ্যাসাদ্ ধার্যতে বিদ্যা কুলং শীলেন ধার্যতে।

গুণেন জ্ঞায়তে ত্বার্যঃ কোপো নেত্রেন গম্যতে।।

সতত অভ্যাসের দ্বারা অধীত বিদ্যার ওপর অধিকার বর্তায়, চরিত্রবলের কারণে বংশগৌরব অধিগত হয়, সদ্‌গুণের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং চোখ দেখে ক্রোধের পরিমাপ করা যায়।

বিজেপির ‘অ্যাসিড টেস্ট’ উত্তরপ্রদেশে আর মমতার ‘পাখির চোখ’ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এ মাসেই উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন। ছ'মাস পর আগস্টে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কার্যকাল শেষ হবে জুলাই মাসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকাল শেষ হবে ২০২৪-এর মে মাসে। বিজেপির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ৭৫ বছরের পর দল বা সরকারের কেউ পদে থাকতে পারবে না। তাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হয়তো এটাই নরেন্দ্র মোদীর শেষ কার্যকাল। ২০২৪-এ নরেন্দ্র মোদী ৭৪ বছর হবেন।

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে মোদীকে পদ ছাড়তে হবে। আমার মতে সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা কম, কারণ মোদী নিজেই ওই সিদ্ধান্তের অংশীদার। সিদ্ধান্ত পালটাতে বা বাতিল করতে হলে মোদীকে নিজেকেই নিজের সিদ্ধান্ত খারিজ করতে হবে। আমার ধারণা তা ‘না মুমকিন’ বা অসম্ভব। মোদী তা করবেন না। সাংবাদিক হিসাবে সে ধারণা ভুল হলে আমি মেনে নেব। সমীক্ষা অনুযায়ী এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দ্বিতীয় স্থানে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোদীর সমীকরণ লিখতে গিয়ে আমি আগেও বলেছি দলে থেকে গেলেও নরেন্দ্র মোদী কোনো পদ ধরে রাখবেন না। দেশের কাজে ফিরে যাবেন। কী সেই কাজ নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে সে কাজে যে নতুন চমক থাকবে তা সন্দেহাতীত। বিজেপির তিন মূল অ্যাজেন্ডা বা লক্ষ্যের দুটি পূরণ হয়েছে— রামমন্দির নির্মাণ আর ৩৭০ ধারা বিলোপ। বাকি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। তা সম্ভব করতে সংবিধান আর আনুষঙ্গিক বহু কিছু পালটাতে হবে।

২২তম আইন কমিশনে এ নিয়ে শীঘ্র আলোচনা শুরু হবে। গোয়াতে এই ধরনের সাধারণ দেওয়ানি বিধি রয়েছে। ২০১৯-এর নির্বাচন ম্যানিফেসটোতে বিজেপি অভিন্ন বিধির দাবি তুলেছিল। অভিন্ন বিধি তৈরি হবে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত বিধি একসঙ্গে যুক্ত করে। এই দুরূহ কাজ রাষ্ট্রপতি ভবনের সহায়তা আর সংসদের দু'কক্ষের সমর্থন ছাড়া অসম্ভব। ১৯৭৬ সাল থেকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় রয়েছে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি। তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। আমি নিশ্চিত আগস্ট মাসের পর রাষ্ট্রপতি ভবনে যুতসই ও শক্তপোক্ত ব্যক্তি পেলে বিজেপি সে কাজে হাত দেবে।

লোকসভাতে এগিয়ে থাকলেও রাজ্যসভাতে পিছিয়ে বিজেপি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে প্রয়োজন ১২৩ আসন। বিজেপি শাসিত এনডিএ-র রয়েছে ১২০ আসন। এককভাবে বিজেপির ৯৩। পাঁচ রাজ্যের ভোটের পর এই অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ হবে। ২০২২-এ ৭৪ ও ২০২৪-এর মধ্যে ১৪৩ আসনে ভোট রয়েছে রাজ্যসভায়। এই মুহূর্তে ৮টি রাজ্যে বিজেপি নিরঙ্কুশ। আনুমানিক ৪১০০ বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে ১৫০০ আসন। ৬টি রাজ্য থেকে বিজেপি পেয়েছে ৯৫০টি আসন। তামিলনাড়ুর মতো বড়ো রাজ্যে বিজেপি শূন্য রয়ে গিয়েছে। রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে গেলে উত্তরপ্রদেশে খুব বড়ো ব্যবধানে বিজেপিকে জিততে হবে। নচেৎ স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে। সারা দেশে প্রায় ৪৬ শতাংশ বিধানসভা আসনে হেরে গিয়েছে বিজেপি।

> “দেশের সর্বোচ্চ পদের জন্য বিজেপি বা কংগ্রেসে অনেক মর্যাদার প্রার্থী রয়েছেন। তবে দেখার কাকে পছন্দ মমতার? কাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী চান মমতা? সেদিকে তাকিয়ে থাকব।”

চতুর রাজনীতিক মমতা চিরকাল ঘোলা জলে মাছ ধরতে অভ্যস্ত। তাঁর প্যাঁচে পড়ে সিপিএম-এর মতো আত্মম্ভরী দলও কুপোকাত হয়ে যায় ২০১২-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। তৃণমূলের সঙ্গে তারা প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ভোট দেয়। আমার ধারণা মমতার কাছে আগস্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ভাবমূর্তি তুলে ধরতে তাঁর এই সিঁড়ি প্রয়োজন। তাই রাষ্ট্রপতি ভবনে মনমতো প্রার্থী পেতেই উদগ্রীব মমতা। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন জেতার পর আরও শক্তিশালী হয়েছেন মমতা। তাই এখন থেকেই তলে তলে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। তাঁকে সহায়তা করছে আই-প্যাক। আই-প্যাকের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ২০২৬ পর্যন্ত। মমতা ছাড়া রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ বেশ কঠিন। রাজ্যের ২২১ বিধায়ক আর ২৫ সাংসদ নিয়ে অনেকটাই ক্ষমতাশালী মমতা। দেশের সর্বোচ্চ পদের জন্য বিজেপি বা কংগ্রেসে অনেক মর্যাদার প্রার্থী রয়েছেন। তবে দেখার কাকে পছন্দ মমতার? কাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী চান মমতা? সেদিকে তাকিয়ে থাকব।

বিয়ের মাসেই মধুচন্দ্রিমা শেষ

মাননীয়া মমতা দিদি,

প্রণাম নেবেন দিদি। প্রতিবারই খেয়াল করবেন আপনাকে চিঠি লেখার শুরুতেই আমি একটু প্রণাম জানিয়ে নিই। না দিদি, সত্যি সত্যিই শ্রদ্ধা থেকে এই প্রণাম। এবারও দিদি চিঠি লিখছি আপনাকে লাল সেলাম জানাব বলে। সরি সরি, গেরুয়া সেলাম না, সবুজ। সবচেয়ে ভালো নীল-সাদা সেলাম। ওই যে দিদি আপনি পিকে ব্যাটাকে একটা এসএমএস পাঠিয়েছেন বলে শুনছি সেটার জন্য। সত্যি ছোট্টো একটা এসএমএস কিন্তু তার কত বড়ো অর্থ। সত্যি দিদি আমার প্রণাম নেবেন। আমার মতো আপনার আরও অগণিত অনুরক্ত ভাইদের হয়েও আমার প্রণাম নেবেন। পিকে ব্যাটাও বুঝবে, ওর ন্যাতা অভিষেক ভাইপোও বুঝবে। এবার দিদি অভিষেকের নাক, কান মুলে দিয়েছেন আপনি। দলের ভিতরে থেকে দল করছে! কত বড়ো সাহস! তাও কিনা আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানানো গ্রুপবাজি। এবার ওঁর সিকিউরিটিটা কমিয়ে দিন। দেখবেন তখন ও বুঝতে পারবে ও আসলে কোনও কেউকেটে কেউ নয়। সবই আপনার ছায়ায় থেকে সাংগঠনিক মস্তানি।

এখন মাঘ মাস। চারিদিকে বিয়ে বিয়ে গন্ধ। ফেসবুক খুললেই বিয়ে আর বিবাহবার্ষিকীর ছবি। তার মধ্যেই এ এক মধুচন্দ্রিমা শেষ হওয়ার কাহিনি। আমি যা শুনলাম তাতে বিষয়টি এত দূর গড়িয়েছে যে ক'দিন আগে পিকে ব্যাটা 'টেক্সট মেসেজ' পাঠিয়ে দিদি আপনাকে জানান, তৃণমূলের সঙ্গে বাংলা, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে তাঁরা আর কাজ করতে চান না। এই বার্তাকে আপনি কার্যত হুঁশিয়ারি বলে মনে করেন এবং তৎক্ষণাৎ জবাব দেন 'থ্যাঙ্ক ইউ।' ঠিক করেছেন দিদি।

ভাইপোকে তো আর কিছু বলা যায় না। এটা হলো ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। সে যাই হোক, ভালো করেছেন। একটা ব্যাপার ভাবুন এবার পুরভোট নিয়ে যেটা করল সেটা কি করা যায়! নাকি করা উচিত! আপনাকে না বলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিল। ও

> মোদীকে ২০২৪-এ হারানো আপনার কম্মো নয়। এমনটাও বলেছেন যে, বর্তমানে যেসব বিরোধী দল এবং রাজনৈতিক জোট রয়েছে, তাদের দ্বারা মোদীকে বা বিজেপিকে হারানোর মতো কঠিন কাজ সম্ভব নয়।

দলের গোষ্ঠী রাজনীতির বোঝেটা কী! এই তো সেদিন এল। আমার দিন তারিখ সব মনে আছে দিদি। আইপ্যাকের কর্ণধার হিসেবে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পি কে) বাঙ্গলায় তৃণমূলের জন্য কাজ করতে আসেন ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পরে। সেই যে বিজেপির কাছে ভরাডুবির পরে। সেবার রাজ্যে বিজেপির কাছে তৃণমূল ধাক্কা খেয়েছিল। ভাইপো অভিষেকের মাধ্যমে পি কে তখন রাজ্যে আসেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট-কৌশল তৈরি থেকে প্রার্থী বাছাই পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন পিকে। যদিও আমি জানি দিদি, আড়ালে আপনিই ছিলেন সব। তবে ভোটে কারচুপির জন্য আপনি যে ওঁর উপরে ভরসা করেছিলেন এবং ফল পেয়েছেন সেটা মানতেই হবে। গণনার দিন যে খেল দেখিয়েছে, কিংবা ভোটের প্রচারে সরকারি কর্মচারী সেজে যে ভাবে রাজ্যের প্রকল্পে সুবিধা পেতে হলে জোড়াফুলেই ভোট দিতে হবে বলে গরিব গুর্বো গ্রামীণ ভোটারদের হুমকি দিয়েছিলেন পিকের লোকজন তা দিদি আপনার মতো আমিও জানি।

দিদি আপনার ওই লোকটাকে আরও একটা কারণে একদম পছন্দ হচ্ছিল না ইদানীং। আপনি যোগী আদিত্যনাথকে হারাতে লখনউ সফর করছেন। আপের ঝাঁটা ছেড়ে অখিলেশের সাইকেলে চেপেছেন। নরেন্দ্র মোদীর পালটা দিতে বারাণসী সফরের কথা ভাবছেন। আর পিকে কী বলেছে সে তো সবাই জানে। এই চিঠি শেষ করার আগে ব্যাটার বক্তব্যটা শুধু আরও একবার শুনিয়ে দিই। বলে কিনা মোদীকে ২০২৪-এ হারানো আপনার কম্মো নয়। এমনটাও বলেছেন যে, বর্তমানে যেসব বিরোধী দল এবং রাজনৈতিক জোট রয়েছে, তাদের দ্বারা মোদীকে বা বিজেপিকে হারানোর মতো কঠিন কাজ সম্ভব নয়। পিকে বলেন, '২০২৪-এ বিজেপিকে কি হারানো সম্ভব? আমি এর উত্তরে জোর দিয়ে বলতে চাই, অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু বর্তমানের নেতা, দল এবং তাদের যা জোট রয়েছে, তারা কি পারবে বিজেপি-কে হটাতে? সম্ভবত না।'

দিদি, আপনি ঠিকই ধরেছেন একটা 'সম্ভবত' বলে আসলে পিকে আপনাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। □

অতিথি কলম

গিলেস ভার্নিয়ার্স

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড়ো জয় একান্ত প্রয়োজন কেন?

নির্বাচনী রণক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির শুধুমাত্র জয় হাসিল করা যথেষ্ট নয়। দরকার সহজ ভাষায় বিপুল জয়, কেননা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দলের বৃহত্তর সর্বভারতীয় পরিকল্পনা। এই সূত্রে প্রথম দফা ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ইউপির প্রচার ততই তীব্র হচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বিভিন্ন বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার সোচ্চার করে তুলছে। তবু আক্রমণের অভিমুখ ক্রমাগত ধারালো করার প্রয়াস সত্ত্বেও শাসক দলের কাছে সামগ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশ কিছুটা বাড়তি জায়গা থাকছে।

অবশ্য এই পরিস্থিতিতে বিজেপিও হাত গুটিয়ে বসে নেই, তারাও প্রচারের কোনো পন্থা ছাড়ছে না। দলের মধ্যে প্রচারের কোনো খামতি যাতে উদ্বেগ আশঙ্কার অবকাশ না তৈরি করে সে কারণে সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও তারা ঢিলেমি দিচ্ছে না। বিষয়টা হয়তো অনেকের কাছে একটু বিসদৃশ মনে হতে পারে যেহেতু শাসকদল শুরুর আগেই একটু এগিয়ে আছে। এই প্রাণপণ লড়াইয়ের পরিস্থিতির উদ্ভবের একটি সম্ভাব্য কারণ যতটা না বিরোধী পক্ষের আক্রমণ তার চেয়ে বেশি দলীয় অভ্যন্তরীণ অসন্তুষ্টদের জন্য। এই কারণে দলের কাছে কানঘেঁষা নয়, একেবারে ঝড়ো জয় যা সাম্প্রতিক সময়ে তারা অনেক জায়গাতেই পেয়েছে সেটিই প্রয়োজন।

২০১৭ সালের বিধান সভার আসনের ৭৭ শতাংশ আসন বিজেপি দখল করেছিল ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে। এই ৪০ শতাংশ অবশ্য তাদের সামগ্রিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সমস্ত আসনের ৪১.৬ শতাংশের আসনের মধ্যে। আবার ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দল ৮০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসন মোট ভোটের ৪৯.৫ শতাংশ পেয়ে দখলে এনেছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, বিধান সভার নিরিখে তারা ২০১৭-এর থেকে কম ২৭২টি বিধানসভা ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল।

অবশ্যই দুটি নির্বাচন চরিত্রগতভাবে আলাদা। কিন্তু আসন জয়ের ক্ষেত্রে এই তারতম্য প্রমাণ করে ভোট শতাংশ আগের মতো বজায় রাখলেই যে সমপরিমাণ আসন জেতা যাবে সেটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩২৫টি আসন ৪৯.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৭৫টি বিধানসভা আসন জেতা সরল সমীকরণে মেলে না। এর কারণ কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। কোথাও বিপুল ভোটে এগিয়ে জয়, কোথায়-বা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে সামান্য ভোটে পরজয়। কিন্তু জয় জয়ই আর হারের বাড়া মার নেই। ওই বড়ো জয়ের ভোট আর কম ভোটে হারের ভোটের যোগফল তো সামগ্রিক ভোট শতাংশ। তাই ভোট বিশাল রাজ্যটির কত বেশি আসনের মধ্যে একটা সমতা রেখে ছড়িয়ে পড়তে পারবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা হারালে স্বল্প মেয়াদে বিজেপির সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষমতার ভারসাম্যের হেরফের হবে না। কিন্তু জনমনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে ভাবনা দেশের হৃদয়-বিন্দুতে (উত্তরপ্রদেশ) বিজেপির ওপর হাত ছোঁয়ানো কল্পনাতীত তা বড়ো ধাক্কা খেতে পারে। অতএব উত্তরপ্রদেশ নিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড়ো জয় একান্ত প্রয়োজন।

একটা সময় কংগ্রেসের একাধিপত্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক রজনী কোঠারী মন্তব্য করেছিলেন, উত্তরপ্রদেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাই চলে। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি কংগ্রেসের সর্বাধিক প্রাপ্ত যে কোনো সময়ের ভোটের চেয়ে বেশি পরিমাণ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু আজ ভোটের বিভাজনের গভীরতা বহু দলের মধ্যে কম বেশি, পরিমাণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়ায় যেখানে অন্তত ৩টি দলের সমর্থন বেশ জানান দেয় এবং বহু আসনে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে এত পরিমাণ ভোট দখল করা খুব সহজ কথা নয়, উলটে বেশ চ্যালেঞ্জিং তো বটেই। এটা ঠিকই যে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে বিধানসভায় সরকার গঠন করার মতো আসন দখল করার ক্ষমতা বিজেপির আছে। এটা জানা থাকার ফলেই সমাজবাদী দল চূড়ান্ত চেষ্টা করে ক্ষমতা দখলের কৌশল করছে। এর ফলে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে এখনও বিরোধী ভোটের মিলিত হতে না পারা বিজেপিকে বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে। কিন্তু আমার মতে শুধুমাত্র জেতাই যে বিজেপির পক্ষে যথেষ্ট নয় বিশেষ করে আজ দল সেখানে যে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার স্বপক্ষে আমি কম করে চারটি যুক্তি দিচ্ছি।

(১) ভালো হোক বা মন্দ যে কোনো মানদণ্ডেই আজও উত্তরপ্রদেশকেই সারা ভারতের জাতীয় রাজনীতির মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। এই সূত্রে ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে দলের বিশাল জয় দেশবাসীর মনে একটা ধারণা তৈরি করেছিল যে বিজেপি

অপ্রতিরোধ্য দল। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৯-এর লোকসভা জয় অনেকটাই সহজ হয়। মূলত জনমানসের ভাবনাস্তরে ততক্ষণে বিজেপি প্রবেশ করে ফেলেছে অজেয় হিসেবে। তাই উত্তরপ্রদেশে যদি দল জমি হারায় তাহলে এ ধারণা তৈরি হতে বেশি সময় লাগবে না যে বিজেপিকে যে কোনো রাজ্যেই হারানো যায়।

(২) বর্তমানে লোকসভায় বিজেপি এককভাবে ৩০১টি আসন নিয়ে মোট আসনের ৫৫.৫ শতাংশ দখল করে আছে। এটা স্বস্তিদায়ক গরিষ্ঠতা হলেও একেবারে বিশাল বা ধরাছোঁয়ার বাইরের গরিষ্ঠতা এমনটা নয়। এই বর্তমান গরিষ্ঠতাকে ধরে রাখা বহুলাংশেই বিজেপির হিন্দি বলয়ে আধিপত্যের ওপর নির্ভরশীল। এখানে তারা ২২৬টি আসনের মধ্যে ১৭৫টি নিজেদের দখলে রেখেছে। এই সংখ্যা হিন্দি বলয়ে মোট আসনের ৭৭ শতাংশ।

২০১১ সালে বিজেপি রাজস্থানে ঝেড়ে পুছে মোট ২৫টির মধ্যে ২৪টি, মধ্যপ্রদেশে ২৯-এ ২৮, হরিয়ানায় ১০-এ ১০, ঝাড়খণ্ডে ১৪-য় ১১, দিল্লিতে ৭এ ৭, উত্তরাখণ্ডে ৫এ ৫ আর অবশ্যই উত্তরপ্রদেশে ৮০-তে ৬২টি আসন দখল করেছিল। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্যের নির্বাচনে বিজেপি সেখানে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা যে তাদের সীমিত তা প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে হিন্দি বলয়ের প্রাধান্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আরও একটা বিষয় পরিষ্কার, কংগ্রেস যেখানে বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে দলের ভালো ফল করার বাড়তি সম্ভাবনা থাকছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে সম্প্রতি টগবগে হয়ে ওঠা সমাজবাদী দল বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতেও দাঁত ফোঁটাবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই রাজ্য নির্বাচন ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে আর নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ে কেউ সেটা ভালো বোঝে না। তবুও উত্তরপ্রদেশে নজরকাড়া ফল করতে পারলে সমাজবাদী দল বাড়তি উদ্যম নিয়ে ২০২৪-এর লোকসভার জন্য তেড়েফুঁড়ে লাগতে পারবে।

(৩) এই নির্বাচন সামগ্রিক সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলে যে ধরনের পরিমণ্ডল সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে তার থেকেও বেশি দোলাচল তৈরি করতে পারে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান কর্ণধার আদিত্যনাথ যোগীর ওপর। তাঁর বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা অস্বাভাবিক নয়। ২০১৭ সালের রাজ্য নির্বাচনে তিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি কড়া হাতে সরকার পরিচালনা করে এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন যে তিনি অনায়াসে দলকে বর্তমানের শক্ত ভিতের ওপর ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর নিজস্ব অনেক পরিকল্পনা উত্তরপ্রদেশে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করে দলের অবস্থানকে মজবুত করেছেন। যে কারণে আসন কমে যাওয়ার অর্থ জমি হারানো যা বৃহত্তর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাকে এগিয়ে দেওয়ার সহায়ক নয়।

(৪) সর্বশেষে, উত্তর প্রদেশে ক্ষমতা পরিচালনা করা, আধিপত্য প্রদর্শন কেবলমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে বিবেচিত হয় না তা বিজেপির বিশেষ সিম্বল বা পরিচয় চিহ্ন হিসেবেও মান্য হয়। এইটিই সেই রাজ্য যেখানে বিজেপি তার মূলগত আদর্শের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলি মরণপণ করে লড়েছে। যা বহু ক্ষেত্রে রক্তাক্ত সংগ্রামেও পরিণত হয়েছিল।

এখানেই সাড়ে ৪৫০ বছর পরে বহু সংগ্রামের পর রামমন্দির পুনর্নির্মিত হচ্ছে। এই রাজ্যেই বিজেপি ধর্মের ভিত্তি এক হলেও বিভিন্ন বর্গের ও জাতিতে বিভক্ত সমাজকে একসূত্রে বাঁধবার মরীয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, এটিই ভারতের একমাত্র রাজ্য যা পরিচালনা করছেন একজন হিন্দু নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী। যিনি সংখ্যালঘুদের বেয়াদপি দমন করতে, নারীদের সম্ভ্রম রক্ষায় নিজের মতো করে আইন লাগু করতে দ্বিধা করেননি। এখানে তাঁর নিজস্ব ঘরানায় ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ তিনি অবলীলায় ঘটিয়েছেন। তিনিই প্রথম সংকেত দিয়েছেন সর্বভারতীয় পরিসরে হিন্দু রাষ্ট্রের একটি আবছায়া প্রতিচ্ছবি কেমন হতে পারে। নিশ্চয় উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা হারালে স্বল্প মেয়াদে বিজেপির সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষমতার ভারসাম্যের হেরফের হবে না। কিন্তু জনমনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে ভাবনা দেশের হৃদয়-বিন্দুতে (উত্তরপ্রদেশ) বিজেপির ওপর হাত ছোঁয়ানো কল্পনাতীত তা বড়ো ধাক্কা খেতে পারে। ২০২৪ তা আরও কণ্টকাকীর্ণ হতে পারে। তাই এই মহারণ।

(লেখক হরিয়ানার অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

পাল, পূঃবঃ, ৩৮+/৫'১০"/নর MVA (ফাইন আর্টস) গ্রাফিক ডিজাইনার, নিজস্ব এডিটিং হাউস, ডিডি নিউজ-এ ভিডিও এডিটর। শিক্ষিতা ঘরোয়া সুশ্রী দেব/নর অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্রী চাই।
মোঃ ৬২৯১২০৬৬১৬

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গের হুগলী জেলার বীরপালা শাখার স্বয়ংসেবক অসীম ঘোষ গত ১৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। বাল্যকালে গ্রামের শাখায় স্বয়ংসেবক হন। দ্বিতীয়বর্ষ শিক্ষিত। শাখার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সঙ্গে হুগলীর গ্রামীণ এলাকায় শাখা বৃদ্ধির জন্য ১ বছরের বেশি সময় বিস্তারক হিসাবে কাজ করেছেন। ভালো গান গাইতেন। সহজ-সরল ব্যবহারে সকলের আপনজন হয়ে উঠতেন সহজেই। তিনি মা, দুই ভাই, স্ত্রী, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার পুরাতন মালদা নগরের কার্যবাহ মানিক হালদারের পিতৃদেব কিশোরী হালদার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ৩ পুত্র রেখে গেছেন।

প্রার্থী তালিকা নিয়ে শাসক দলের দ্বন্দ্ব ঠিক কোথায় ?

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলার এন্টারটেইনমেন্টে এবার নতুন খোরাক রাজ্যের শাসক দলের 'ডিজিটাল' অন্তর্ঘাত। কিন্তু মনে এই প্রশ্ন জাগছে, প্রবল প্রতাপান্বিত শাসকদলে অন্তর্ঘাত করার সাহস হলো কার? পিকের কোম্পানির? নাকি আদৌ কোনো অন্তর্ঘাতই হয়নি? বরং স্বাভাবিক নিয়মে এটা হওয়ারই ছিল। বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ঘটনা হলো, আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে গণ্ডগোল। সেই গণ্ডগোলের দরুন রাজ্যের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ প্রার্থী হতে না পারার ক্ষোভে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি আরম্ভ হয়েছে। কোথাও আবার তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার দুই শিবিরের পৃথক প্রচার কিংবা মারামারি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি হলো কেন? সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পুরভোটে শাসক দল দুই প্রকারের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করেছিল। একটি দলীয় ভাবে, অপরটি পিকের সংস্থা আইপ্যাকের মাধ্যমে। এই দুই তালিকা সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন সুব্রত বকসী ও পার্থ চ্যাটার্জি। সূত্রের খবর, চূড়ান্ত তালিকা দলের সর্বেসর্বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে না পৌঁছানোয় এবং বারংবার আইপ্যাককে তাগাদা দেওয়ার পরও পিকের সংস্থার তরফে কোনো হেলদোল না থাকার কারণে নাকি বিরক্ত মমতা নির্দেশ দেন বকসী-পার্থ চ্যাটার্জির তৈরি তালিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য। এদিকে ঘটে আরেক বিপত্তি। অভিযোগ, আইপ্যাকের তরফে তাদের তৈরি করা তালিকাটি দলের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই তালিকায় প্রভূত গরমিল। এই নিয়ে দলের অন্দরে রীতিমতো মুষল পর্ব শুরু হয়েছে, মাঝখান ভোগান্তি বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

অনেকে একে 'ডিজিটাল অন্তর্ঘাত' বললেও কয়েকটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। পিকের দলের হাতে এমন কোনো জাদুদণ্ড ছিল না, যা দিয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ফের রাজ্যের ক্ষমতায় আনতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ২০০১ সালে বাম জমানায় অনিল বিশ্বাস যে কৌশল ব্যবহার করেছিলেন, অর্থাৎ জ্যোতি বসুকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে, কারণ সাড়ে তেইশ বছরের অপশাসন জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের রোষ তখন আছড়ে পড়ছিল, তাই তাঁকে সরিয়ে বুদ্ধবাবুকে এনে সে যাত্রা সিপিএমকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, ভোট জিতিয়ে এনেছিলেন অনিল বিশ্বাস। ঠিক এই একই পন্থায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর অসন্তোষে প্রলেপ দিতে প্রধান মুখ পালটালো না ঠিকই, কারণ তাহলে দলের অস্তিত্বেরই সংকট হতো। কিন্তু বিধানসভায় টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে বহু পুরনো মুখকে পালটে দেওয়া হলো। বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সাফল্যের কারণ এটাই। কারণ পুরনো মুখেদের বিরুদ্ধে মানুষের এত অসন্তোষ ছিল যে, মানুষ আর তাদের চাইছিলেন না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে মমতা ব্যানার্জির বিকল্প মুখ হিসেবে খাড়া করতে চাইছিলেন, কিন্তু মমতার চিরকালের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বলছে তিনি কখনোই তাঁর বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হোক এটা মানেননি, তা সে নিজের ভাইপো হলেও নয়।

পুরভোটে ঠিক সেই নীতিতে চলতে চাইছিল অইপ্যাক। অভিযোগ, তৃণমূলের কাউন্সিলাররা নাকি এত কামিয়েছেন যে দশ বছরে রাজ্যের মানুষের গরিবি, বেকারত্ব বাড়লেও তাঁরা আর তাঁদের আত্মীয়রা কিন্তু ঠিক কোটিপতি হয়ে গেছেন। এই অসন্তোষের দিক থেকে মুখ ফেরাতেই প্রার্থী বদল করে রাজ্যের মানুষকে ফের একবার বোকা বানানোর ছক কষেছিল পিকের সংস্থা। কিন্তু তৃণমূলের খানেওয়ালা নেতারাই-বা এত সহজে ছাড়বেন কেন? সুতরাং দলের অন্দরে এনিয়ে সংঘাত বাড়ছিলই। পুরভোটের তালিকা ঘিরে তাই যেন চরম আকার ধারণ করলো। তারই নিটফল, ভোটে নিশ্চিত হার থেকে ম্যাচ ঘোরানোর পরও পিকের টিমের সঙ্গে তৃণমূলের গাঁটছড়া খোলা এখন সময়ের অপেক্ষা। তার চেয়েও ইন্টারেস্টিং, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে দলের দ্বিতীয় কম্যান্ড হিসাবে তৈরি করেছিলেন, সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আইপ্যাককে এরাজ্যে ডেকে এনেছিলেন তাঁর ডানা ছাঁটার প্রক্রিয়াও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তিনি নিজেকে এই সুযোগে 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে মমতা ব্যানার্জির বিকল্প মুখ হিসেবে খাড়া করতে চাইছিলেন, কিন্তু মমতার চিরকালের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বলছে তিনি কখনোই তাঁর বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হোক এটা মানেননি, তা সে নিজের ভাইপো হলেও নয়। কিন্তু এই যুদ্ধে রাজ্যের পুর-পরিষেবার মান যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে এবং শাসক দলের নেতাদের কামাতে না পারার আক্রোশে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি ও সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয় কিনা তার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। □

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর

সন্দীপ চক্রবর্তী

এই নিবন্ধের শিরোনামটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া। শেষের কবিতা উপন্যাসে একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার দুটি পঙ্‌ক্তি এরকম ঃ 'দোহাই তোদের, একটু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।' ভ্যালেন্টাইনস ডে'র কয়েকদিন আগে সারা পৃথিবী যখন ক্যালেন্ডারে ভালোবাসার জন্য নির্দিষ্ট দিনটিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত তখন ভালোবাসা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসার গায়ে যে স্নিগ্ধতার প্রলেপ এঁকে দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভালোবাসা নিতান্তই ব্যক্তিগত, হাটের মাঝে নিয়ে গিয়ে তাকে খেলো করার জিনিস নয়।

পশ্চিমি দুনিয়ার সব কিছুই ভারী উচ্চকিত। যে কথাটি দুটি হৃদয়ের নিভৃতিতে গুঞ্জরিত হয়, যার যাতায়াত কেবলমাত্র একজনের মুখ থেকে আরেকজনের কানে— তাকে দশজনের মাঝখানে এনে হাততালির শব্দে ঢাকা দিতে না পারলে পশ্চিমি দুনিয়া স্বস্তি পায় না। অনেকে বলেন, ইউরোপ -আমেরিকা জীবনকে উপভোগ করতে জানে। ওরা এও বলেন, ভারতবর্ষের মানুষ দিনগত পাপক্ষয় করার অজুহাতে বেঁচে থাকে কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের রস পান করে মাতাল হতে জানে। সেইজন্য নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কেও ওরা ভাগ করে নেয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভ্যালেন্টাইনস ডে'র স্বপক্ষে কিছু যুক্তি তৈরি হয়। যেহেতু জীবন ভোগের জিনিস, সুতরাং ভালোবাসাও তার ব্যতিক্রম নয়। সারা বছরের আটপৌরে ভালোবাসাকে বিশেষ একটা দিনে একটু বেশি রকমের আশকারা দিলে মানুষ আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে। এটাই সেই যুগান্তকারী ফর্মূলা যার সফল প্রয়োগ পেরেন্টস ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে, রোজ ডে ইত্যাদির সৃষ্টি।

ক্ষমা করবেন পাঠক। বর্তমান নিবন্ধ লেখক মোটেই ইউরোপ-আমেরিকা বিরোধী নয়। কিন্তু সেই সমর্থন শুধুমাত্র ভাষা, সাহিত্য, প্রযুক্তি ও মানবচরিত্রে দুটি বিশেষ গুণ সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং দেশানুরাগের নিরিখে। এর বাইরে অন্য কোনো রীতিরেওয়াজ আমদানি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষ করে সেই রীতিরেওয়াজের সঙ্গে যদি কোনো দেশের মূলগত সংস্কৃতির মিল না থাকে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতবর্ষের সনাতনী চিন্তাভাবনার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনস ডে'র দোকানদারি ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব সেটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় পুরুষ যখন কোনো নারীর প্রেমে পড়ে তখন তার ভাবনায় মূর্ত হয়ে ওঠে একটি পরিবারের ছবি। সে পরিবার এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে লীন কিন্তু দুটি হৃদয়ের ভালোবাসায় তা ফুটে উঠবে একদিন। আরও অনেকদিন পর সন্তানসন্ততি আসবে পরিবারে। বাবা ও মা হয়ে পূর্ণতা পাবে আজকের সদ্য প্রেমে পড়া ছেলে ও মেয়েটির সম্পর্ক। এখানে পরিবার ও সম্পর্ক — এই দুটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে প্রেম সতত পরিবারমুখী এবং এখানে দুজন নারী-পুরুষের ভালোবাসা ব্যক্তিগত ভোগ-উপভোগের পরিসর ছাড়িয়ে একটি সামাজিক সম্পর্ক বা বন্ধন সৃজনে প্রয়াসী। আমাদের দেশের কোনো মেয়ে সাধারণভাবে তার ভালোবাসার মানুষটিকে বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে শুধুমাত্র কপোত-কপোতীর বাসা বাঁধার অনুরোধ করেন না। কারণ তিনি জানেন মাটি থেকে উপড়ে গাছকে বারান্দার টবে এনে বসালে সে শুধু শোভাই বাড়াবে, ছায়া দিতে পারবে না। নিজের মাটিতে যা ছিল সম্পদ, স্বামী-স্ত্রী-বাচ্চা আর পোষ্য অ্যালসেশিয়ানের সংসারে তাই বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। ছোটোবেলা থেকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয় আমাদের দেশের মেয়েদের। তাই বলে কি ব্যতিক্রম নেই? আছে, থাকবেও। কিন্তু ব্যতিক্রম চিরকাল বিপ্রতীপের ধারণাই শুধু দিতে পারে, মূলধারাকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে ইদানীং ব্রেকআপ ও ডিভোর্সের বাড়াবাড়ন্তের মধ্যেও ভারতবর্ষ তার নিজস্ব সুখী গৃহকোণ রচনা করে নিতে পারে। এই সুখের মূল চাবিকাঠি ভোগ নয়, ত্যাগ। অনেক অভিমান লুকিয়ে থাকে এসব সুখের আড়ালে। কিন্তু দিনের শেষে চার

> **যারা ভালোবেসেছে তারা জানে জীবনের প্রতিটি দিনই ভ্যালেন্টাইনস ডে। প্রতিটি ক্ষণ শুভক্ষণ। যারা বিনা মদেই মাতাল তাদের জন্য ক্যালেন্ডারে একটি তারিখ স্থির করে দেবার দরকার কী?**

দেওয়ালের নিশ্চিন্ত নির্জনতায় মান ভাঙানোর দু'একটি কথার পর যে সলজ্জ হাসিটি ফুটে ওঠে তার অভিঘাতও বড়ো কম নয়। বস্তুত একটি মেয়ের ওই হাসির জন্যই সংসার হাজার ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে টিকে যায়। ভালোবাসার দাবিতে ছোটো-বড়ো নানান ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে টিকে থাকবেও চিরকাল।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইউরোপে আমেরিকায় পরিবার তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেখানে ব্যক্তিকে ঘিরেই অষ্টপ্রহর হইচই হয়। সুতরাং ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মতো একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রীতির স্রষ্টা যে ইউরোপ-আমেরিকাই হবে সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ তো বটেই, তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই এমন একটি আইডিয়া প্রসব করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভ্যালেন্টাইনস ডে কি শুধুই ব্যক্তির প্রেম ও পরিণতির সাফল্যের বিজ্ঞাপন? এবং পিছনে কি আর কোনো গোপন উদ্দেশ্য নেই? অবশ্যই আছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষ্যে যে বিপুল পরিমাণ গিফট আর গ্রিটিংস কার্ড বিক্রি হয় বিশ্বজুড়ে, সেই অর্থে আফ্রিকা মহাদেশের প্রতিটি মানুষকে সারা বছর পেটভরে খাওয়ানো যেত। অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইনস ডে নামক হুজুগের আড়ালে রয়েছে বাণিজ্যিক স্বার্থ। ইউরোপ-আমেরিকার কাছে ভারত একটি লোভনীয় বাজার ছাড়া আর কিছু নয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকান বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ধারণা আত্মরতিকে হীনদৃষ্টিতে দেখা এ দেশের মানুষকে, বিশেষত নব্য ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত তরুণ প্রজন্মকে আত্মসুখ ও সম্ভোগময় চকচকে জীবনের লোভ দেখাতে পারলেই তাদের মাল চড়া দামে বিকোবে। বিকোয় না একথা বলা যাবে না, বিকোয়। শুধু মাল বিক্রি করাই যদি উদ্দেশ্য হতো তা হলে এখানেই শেষ হয়ে যেত আমাদের গল্প। কিন্তু পাঠক, এসব বাণিজ্যিক সংস্থার উদ্দেশ্য এত সরল নয়। আধুনিক বাণিজ্যিক দর্শন ক্রেতাকে উপভোক্তা বানাবার কথা বলে। আর একবার যদি আপনি কোনো পণ্যের উপভোক্তা বা কনজিউমার হয়ে ওঠেন তাহলে সেই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। অর্থাৎ আপনি ধীরে ধীরে গিফট আর গ্রিটিং কার্ডের চমকপ্রদ চাকচিক্যের মোহে ভ্যালেন্টাইনস ডে নামের একটি ভিনদেশি কালচারের দখলে চলে যাবেন। এবং নিজের আজন্মলালিত সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে শুরু করবেন। আপনার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের যত অবক্ষয় হবে ততই জাঁকিয়ে বসবে বিদেশি সংস্কৃতি। ভ্যালেন্টাইনস ডে'র সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার পার্ক স্ট্রিট দিয়ে যাওয়ার সময় ভালোবাসার নামে মদে-মদিরায় মত্ত কোনো প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখে আপনার হয়তো মনে হবে এরা কি বাঙ্গালি কিংবা এরা কি ভারতীয়? কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের স্টাইলে আপনি ওদের চিবুক ধরে বলতে পারবেন না, তোমরা বাপু মিসগাইডেড। কারণ ততদিনে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ছবিটা আপনার কাছেও ঝাপসা হয়ে গেছে। ভারতীয়ত্ব বলতে তখন আপনার হাতে আছে শুধু একটা পেনসিল।

মোদ্দা কথা হলো, ভ্যালেন্টাইনস ডে প্রকৃতিতে ভারতীয় নয়। এশিয়ার কোনো দেশের সঙ্গেই এর নাড়ির যোগ নেই। এই দিনটি ভাঙিয়ে ব্যবসা করার কথা প্রথম যাদের মাথায় এসেছিল তারাও এটি জানতেন। কিন্তু ভালোবাসার দিনের সঙ্গে খ্রিস্টান যাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নাম যুক্ত থাকায় তাদের সুবিধে হয়। ঈশ্বরের পুত্রের মানবপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে এই সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের ঘটনাটি খাপ খেয়ে যায়। কী সেই ঘটনা? রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস একবার হুকুম দিলেন কোনো রোমান সৈন্য বিবাহ করতে পারবে না। সেইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক পাদরি ও যাজককে এই নিয়ম প্রচার করতে হবে, যাতে কেউ সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন না করে। সবাই মেনে নিলেও সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এই হুকুম মানলেন না। সম্রাটের সৈন্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করল। ফাঁসির সাজা শোনালেন বিচারক। বলা হয়, বন্দি অবস্থায় সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এক অন্ধ যুবতীকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেই যুবতী তাঁর প্রেমে পড়েন। কিন্তু প্রেম পরিণতি পাবার আগেই ফাঁসি হয়ে যায় ভ্যালেন্টাইনের।

ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। কিন্তু বিপণনের জাদুকাঠি ছুঁইয়ে যেভাবে ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে তা কি সমর্থনযোগ্য? না পাঠক, ভালোবাসার এই অবাধ বিপণন ভারতীয় মননের সঙ্গে মানানসই নয়। মাথায় থাকুন রবীন্দ্রনাথ। শেষের কবিতার একটি কবিতায় কবি লিখেছেন, 'যা তোমারে দিয়েছি তা তোমারই দান/ গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।' ভারতীয় ঘরানায় প্রেমিক তার সর্বস্ব উজার করে দিয়েও ভালোবাসার নারীর কাছে ঋণী থেকে যায়। কারণ সেই নারী তাকে গ্রহণ করেছে। স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন সে পৃথিবীর সবথেকে সুখী মানুষ। এই আনন্দ আরও নির্জনতা চায়। যাতে সে বলতে পারে, দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর। উৎসবের ভিড়ে সেই অবসর কোথায়? সুতরাং প্রেম আসুক ব্যক্তিগত পরিসরে। কিন্তু তার ছায়া পড়ুক সবার ওপর। আর উৎসব?

যারা ভালোবেসেছে তারা জানে জীবনের প্রতিটি দিনই ভ্যালেন্টাইনস ডে। প্রতিটি ক্ষণ শুভক্ষণ। যারা বিনা মদেই মাতাল তাদের জন্য ক্যালেন্ডারে একটি তারিখ স্থির করে দেবার দরকার কী? □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম প্রবহমান সভ্যতা

ভারত দুনিয়ার প্রাচীনতম জীবিত প্রবহমান অক্ষত সভ্যতা। ইতিহাস পড়তে হবে, জানতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই বলেছিলেন বাঙ্গালিদের উদ্দেশে।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

কোন সভ্যতা কত প্রাচীন তার একটা আনুমানিক ধারণা দিয়ে শুরু করা যাক। গ্রিসের সভ্যতা ৩ হাজার বছর, চীন ৩-৪ হাজার বছর, ইজিপ্ট-৫ হাজার বছর, পার্সিয়া ৩ হাজার বছর আর ভারতীয় সভ্যতা কমপক্ষে দশ হাজার বছর পুরনো।

জেনেটিকাল সমীক্ষা :

পপুলেশন জেনেটিক্স থেকে ৫৫০০০ বছর আগেকার এক ইতিহাস পাওয়া যায়। মানবদেহে ২৩টা করে মোট ৪৬টা ক্রোমোজম আছে। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ সেলের ভিতর ২৩ রকম ক্রোমোজম থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ নারীদের মধ্যে থাকে। পুরুষদের স্পার্মে XY ক্রোমোজম আর নারীদের ওভাম বা ডিম্বে XX ক্রোমোজম। XY থেকে পুরুষ সন্তান আর XX থেকে কন্যা সন্তান হয়। আমাদের যে গোত্র তা এই পৈতৃক লিনিয়েজ বোঝায়! মায়ের দিক থেকেও একটা লিনিয়েজ হয়। হ্যাপলোগ্রুপ এফ— ইন্ডিয়াতে এর উৎস ছিল। প্যাট্রোলিনিয়াল লিনিয়েজ--- হ্যাপলোগ্রুপ এফ 'আউট অব আফ্রিকা' বা আফ্রিকা থেকে ভারতে আসে; তারপর 'আউট অব ইন্ডিয়া'--- ভারত থেকে ইউরোপে মাইগ্রেসন হয়েছিল। ৭০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে মনুষ্যগোষ্ঠী ভারতে এসেছিল। ভারত থেকে ইউরোপে গিয়েছিল তার পরে। জেনেটিক্স বিশ্লেষণ করে এই তথ্য উঠে আসছে।

সবচেয়ে পুরনো জেনেটিকাল নিদর্শন হরিয়ানার ভিরানাতে পাওয়া যায়। মানবজাতি ইউরোপ থেকে আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া গিয়েছিল।

সিন্ধু-সরস্বতী সভাতা :

৯৫০০ বছর আগে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে নগর সভ্যতা ছিল। সেখানকার কালচারাল কনটিনিউইটি বা সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আজও বজায় আছে। যেমন হরপ্পায় প্রাপ্ত স্ট্যাচুতে মাথায় সিঁদুর আছে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে ১০০০০ বছরের পুরনো। দশ, পনেরো, বিশ হাজার বছর পুরনো আর্টিফ্যাক্ট মিলেছে। হরপ্পাতে বহুতল বাড়ি ছিল। উন্নত দেশ বলে ভারতবর্ষে সারা পৃথিবী থেকে লোক আসত। উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিল। অথচ তখন চীনে সভ্যতা শুরুই হয়নি। ইউরোপ প্রস্তর যুগে পড়ে ছিল। আফ্রিকায় কিছু ছিল না। মিশরীয় সভ্যতা সবে শুরু হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনতম ধারাবাহিক সভ্যতা যা আজও

হরপ্পা-মাহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ।

বর্তমান। একই সভ্যতা দক্ষিণ ভারতেও ছিল, গঙ্গা ভ্যালিতেও ছিল, বাঙ্গলাতেও ছিল। বিগত ৭০ বছরে কোনো আর্কিওলজিকাল রিসার্চ হয়নি সেইভাবে তাই জানা যায়নি।

রামায়ণ-মহাভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন :

সরস্বতী ৩৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুকিয়ে যায়, তা গঙ্গার চেয়েও বড়ো নদী, সবচেয়ে বড়ো নদী ছিল। হিমালয় থেকে বেরিয়ে পঞ্জাব, হরিয়ানা, সিন্ধু ও গুজরাটের মধ্য দিয়ে বইত। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সরস্বতী খুব প্রবল ভাবে বেগবান নদী ছিল এবং ভীষণ বন্যা হতো, তাই তাকে 'বন্যার মাতা' বলা হতো নেচার পত্রিকায় পাওয়া যায়, ছ' হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ হতে সরস্বতী ছোটো হতে থাকে। তার মানে ঋগ্বেদ অন্তত আট হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল। বৈদিক সংস্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা।

দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলে প্রাপ্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ :

মহাভারতকে বানানো গল্প বলা হচ্ছে, মানে কেউ কেউ বলছে। কিন্তু সমুদ্রের নীচে বহু লুপ্ত প্রাচীন নগর পাওয়া যাচ্ছে। দ্বারকা নগরীর অবশেষ সম্পূর্ণটাই গুজরাট উপকূলে পাওয়া গেছে। মহাভারতে অর্জুন যখন দ্বারকাতে ছিলেন তখন ভূমিকম্প হয়েছিল। আর দ্বারকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার অর্থ ভূমিকম্পে নগরটা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে। যদি এটা ঠিক হয় তবে বাকিগুলো ঠিক নয় কেন? দক্ষিণে সমুদ্রের গভীরে অনেক মন্দির মিলেছে। রামায়ণে বলা হয়েছে রামের বানর সেনা সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করেছিল। কিন্তু রামেশ্বরম আর মূল ভূখণ্ডের মাঝে সমুদ্রে সেতু তো পাওয়া গেছে (করুণানিধি সেটা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন)। এর চেয়ে প্রাচীন মানুষের তৈরি কোনো স্থাপত্য পৃথিবীতে নেই। এটা সম্পুর্ণ মানুষের তৈরি। বানরসেনা তৈরি করেছিল বলা হয়। বানর মানে এখন যাদের ইংরেজিতে মাংকি বলা হয় তারা তা ছিল না। এরা এক ধরনের হিউম্যান রেস। তার মানে রামায়ণের সেতু নির্মাণের ব্যাপারটাকে কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রামায়ণ মহাভারতে বহু অ্যাস্ট্রোনমিকাল ডাটা পাওয়া যায়— এই এই নক্ষত্র, এই এই গ্রহ, এখানে এখানে ছিল বলা হয়েছিল। এসব খুব নিখুঁত বিবরণ, পর্যবেক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। যাঁরা এইসব লিখেছেন তাঁরা পাগল ছিলেন না যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান না বুঝে আন্দাজে অন্দাজে সব বলে গিয়েছেন। কারণ মানুষের কল্পনাশক্তির একটা সীমা থাকে। আর যা অভিজ্ঞতালব্ধ নয় তা এইরকম ভাবে বর্ণনা করার মতো ধৈর্য রামায়ণ মহাভারত লেখকদের থাকত না। তাতে কিছু খামতি থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক হতে পারে না। এর জন্য চর্চা দরকার, অর্থ দরকার। তাই তহবিল গড়া দরকার। রামসেতু ও দ্বারকা নগরীর কাল নির্ণয় করতে হবে, তবেই সব বলা যাবে।

ভারতবিরোধী তাত্ত্বিকরা বলেন যে সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা। সংস্কৃত ভাষা আর্যদের ভাষা। ৩৫০০ বছর আগে মধ্য এশিয়ার ইউক্রেনের কাছাকাছি জায়গা থেকে নাকি আর্যরা ভারতে এসেছিল, তারা সব শ্বেতকায় ছিল। তারা হরপ্পা সভ্যতাকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিয়েছিল। আর্য-দ্রাবিড়দের মধ্যে লড়াই বাঁধানোর জন্য এই সব বলা হয়, যেমন— হিন্দুধর্ম আর্যদের। কিন্তু আসলে তার উলটোটাই হয়েছিল।

মেল শাখা R 1a 1a শুরু হয়েছিল ১৭-১৮ হাজার বছর আগে। এর ভিত্তিতে বলাই যায় ভারতে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। এই বিশেষ শাখা সবচেয়ে বেশি আছে ভারতে ও ইউরোপে। কারণ ভারত থেকে ইউরোপে অভিগমন ঘটেছিল। সবচেয়ে প্রাচীন ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা সংস্কৃত। তামিল ভাষাও আসলে সংস্কৃতেরই একটা শাখা। ওদের অক্ষরগুলো সংস্কৃতানুসারী অ আ, ক, খ এবং তাদের আকারও সংস্কৃতের অন্য কন্যাভাষাগুলোর সমতুল্য, একটু সমকোণে লেখা হয়। একটাও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে হরপ্পা সভ্যতাকে আগমনকারী আর্যরা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন সংবলিত কোনো কঙ্কাল মেলেনি। এমনকী কোনো আর্কিওলজিকাল প্রমাণও নেই। দশ হাজার বছর ধরে একই সাংস্কৃতিক ধারা প্রবহমান। আক্রমণ বা আগমনের কোনো প্রমাণও নেই।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম সব জায়গাতে একই জেনেটিক্স। এখানকার লোকের গায়ের রং কিছুটা কালো, কারণ তারা বহু বছর ধরে বিষুবরেখার কাছাকাছি আছে। তামিলনাড়ুর লোক কালো এই কারণে। আর কাশ্মীরের লোকের গাত্রবর্ণ তামাটে লাল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত আর উত্তর ভারতের লোকের মধ্যে জেনেটিকালি কোনো ভেদ নেই। আবার গুজরাট আর বাঙ্গলার মানুষের মধ্যে কোনো জেনেটিক ভেদ নেই। আফগানিস্তানের পাস্তুনদের জেনেটিক্সও এক। কালানুক্রম অনুসারেও তাই।

রোমানি :

এক হাজার বছর আগে তুর্কি আক্রমণের কারণে ভারতীয়দের ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যায় বা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। নারীদের ক্রীতদাসী বা যৌন দাসী করে নিয়ে যাওয়া হতো। আবার তাদের কারিগর বা সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রথমে এদের মধ্য প্রাচ্য, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ওরা বলল যে এইসব রোমানিদের তারা পুষতে পারবে না। তারা ভারতেও ফেরত আসতে পারল না, তাই তাদের ইউরোপে ঠেলে দেওয়া হলো। তারা দেশে দেশে ঘুরে মরতে লাগল। এরা যে দেশে থাকে সেখানকার ধর্ম গ্রহণ করে। এরাই রোমানি।

বিখ্যাত রোমানিদের মধ্যে আছেন চার্লি চ্যাপলিন, পাবলো পিকাসো, এলভিস প্রেসলি, মাইকেল কেইন। রোমানি ভাষা গুজরাটি, রাজস্থানি, পাঞ্জাবিদের মতো। ফ্লেমিংগো নাচও রোমানি। রোমানি ভাষার মূল সংস্কৃত ভাষা। জোহান ট্রলম্যান নামে জার্মানিতে একজন রোমানি জার্মান বক্সিংচ্যাম্পিয়ন ছিলেন কিন্তু তার গায়ের রং বাদামি হওয়াতে তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে রেখে মারা হয়েছিল। জার্মানিতে ইহুদিদের সঙ্গে রোমানিদেরও মারা হয়েছিল। ইহুদি যদি ষাট লক্ষ মারা হয়ে থাকে, রোমানি মারা হয়েছিল কমপক্ষে দশ লক্ষ। কিন্তু তাদের জন্য কোনো স্মারকস্তম্ভও তৈরি হয়নি। জার্মান ফুটবলার মাইকেল ব্যালাক রোমানি।

স্পেনের যে বিশিষ্ট সংস্কৃতি তা রোমানি সংস্কৃতি। কিছু কিছু আমেরিকান দেখতে ভারতীয়দের মতো, কারণ তাদের পূর্বপুরুষ

ভারতের সিন্ধু থেকে গিয়েছিল। তুর্কিস্তানে কম করে ৫ শতাংশ রোমানি আছে। ওদের নিজস্ব শিল্প আছে, সংগীত আছে। ইউরোপের সব দেশে রোমানি আছে। তাদের প্রান্তিকীকরণ করা হয়েছে। তাদের অনেকের নাগরিকত্ব নেই। নানা দেশে বহু লোক রোমানি। এদের নোমাডিক লাইফ কাটাতে হয়। ফুটবলার এরিক কনটানা রোমানি। বক্সার আরিসন ফিউরি রোমানি। পূর্ব ইউরোপে বহু রোমানি। আন্দিয়া পিরলো রোমানি। ইউরোপের ৪০ শতাংশ ফুটবলার রোমানি। তারা নিজেরা কেউ বলে না, বললে তাদের নির্যাতন করা হবে। পরিবারের লোক জানে তারা রোমানি। কিন্তু এরা কেউ বলতে পারে না।

ইএন হ্যানকক একজন রোমানি। তিনি বই লিখেছেন, 'উই আর দি রোমানিজ', তাতে আছে এসব কথা। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর এদের একটা টান আছে। ফ্রান্সে একটা ভার্জিন মেরির মূর্তি আছে কালো রঙের, তাকে বলে 'কালী সারা।' বছরে তাকে একবার জলে চুবিয়ে নিয়ে আসে। এটা তো কালী পুজোই। আচার বিচার ভারতীয়দের মতো। ওদের বাচ্চাদের ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইউরোপের খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ পদ্ধতি জোর করে ওদের মানিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়।

ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার, চোল সাম্রাজ্য :

রোম সাম্রাজ্য সম্পর্কে খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়। কিন্তু আমাদের চোল সাম্রাজ্য দেড় হাজার বছর রাজত্ব করেছে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ভারতীয় চম্পা বংশ কম্বোডিয়াতে আছে। চোল রাজারাম পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জয় করেছিলেন। সেখানে তাদের ট্রিবিউটারি বা ভেসাল স্টেট করদ রাজ্য ছিল, তারা ট্রিবিউট দিত। ইন্দোনেশিয়া পুরো হিন্দু ছিল। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডে হিন্দু নামের আধিক্যের কারণ সেটাই। জাপানের বেনজাইতেন ভারতের সরস্বতী। জাপানে গণেশের পূজা হয়। চীনেও রক্ষাকালী আছে। চীনের গ্যানন আসলে অবলোকিতেশ্বর যা আসলে জ্ঞানন।

সমুদ্রের নিচে দ্বারকা নগরী।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা :

ব্রিটিশরা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে দিয়েছে আর সোশ্যাল ইঞ্জিয়ারিং করে ভারতের সুলতান ও মুঘল রাজবংশের কথা পড়ানো হয়। বিজয়নগর, অহম বা পাল রাজত্ব সম্পর্কে কিছু পড়ানো হয় না। ভারতীয়দের মনে একটা হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। সব গ্রামে বিদ্যালয় ছিল এবং মন্দিরে শুধু পুজো হতো না। কোনো জাতিভেদ ছিল না। সাক্ষরতা ছিল প্রায় ১০০ শতাংশ। পুরুষ-নারী শিক্ষার হার সমান ছিল। তক্ষশীলা, সারদাপীঠ, বিক্রমশীল, নালন্দা, তিলহারা, ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হতো। ওখানে আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। বিদেশ থেকে ছাত্র আসত। বখতিয়ার খিলজি নালন্দা ধ্বংস করে ফেলেছে। বহুদিন ধরে নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগারের কয়েক লক্ষ্য বই পুড়েছে। সেখানে হাজার হাজার বছরের লিখিত নথি নষ্ট করা হয়েছে। অনেক দিন ধরে আগুন জ্বলেছিল। ইউরোপীয়রা বলে ভারতের লিখিত নথি নেই। ভুল কথা। নথি ধ্বংস করা হয়েছিল। চীন যখন জানল ভারতে খুব উন্নত দর্শন ছিল, তারা ভারতের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানাত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ধর্মপাল, বুদ্ধধর্মা। চীনারা তাঁর জন্য এক মন্দির বানিয়েছিল। এই মন্দিরের চারপাশে বন ছিল। বুদ্ধধর্মা নিজেদের বাঁচার জন্য যোগভিত্তিক মার্শাল আর্ট চালু করেছিলেন, সেটাই কুংফু। তিনি ধ্যান (মেডিটেশন) করতেন। ধ্যানকে চীনে ভাষায় চান বলা হতো। তিনি মোঙ্গলদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছিলেন, যাকে কুংফু বলা হয়। ক্যারাটে জাপানের আর্ট, এখান থেকেই গিয়েছিল। তাইকন্ডুও তাই। নেহরুর আগে ভারত-চীন সত্যিই ভাইভাই ছিল। কোনোদিন ভারত-চীন যুদ্ধ হয়নি। কমিউনিস্ট হওয়ার আগে চীন এত আগ্রাসী ছিল না। নেহরু তিব্বতের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণ করেননি, তাই গণ্ডগোল হয়েছিল।

বিদেশি আক্রমণের কারণ :

হাজার বছর আগে ভারতের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। তুর্কিরা সেই সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করেছিল। মুঘলরাও তুর্কি ছিল। মধ্য এশিয়ার এক উপজাতি টার্কিক ছিল। মুঘলদের ভাষা ছিল টার্কিক, চৈনিক ভাষার কাছাকাছি। পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরিকে হারিয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ঘোরি লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে চৌহানকে বন্দি করে নিয়ে যায় ও হত্যা করে।

ভারত দুনিয়ার প্রাচীনতম জীবিত প্রবহমান অক্ষত সভ্যতা। ইতিহাস পড়তে হবে, জানতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই বলেছিলেন বাঙ্গালিদের উদ্দেশে। □

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২২
এক নতুন দিশারি

রামানুজ গোস্বামী

সম্প্রতি পেশ করা হলো কেন্দ্রীয় বাজেট-২০২২, যা এই মুহূর্তে অতি উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নবিত্ত পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণীর কাছেই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ব্যাপার। এখন প্রশ্ন, এই বাজেট কেমন হয়েছে— তা কি ভারতের অর্থনীতিকে নতুন কোনো দিশা দেখাতে পারছে বা পারবে; না কি তা একেবারেই এক দিশাহীন সাদামাটা বাজেট! প্রত্যাশা মতোই কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধীদলই এবারের এই বাজেটকে অর্থহীন, দিশাহীন এবং সাধারণ মানুষের জন্য দুর্বিষহ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিশেষণে ভূষিত করেছে। এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও যথারীতি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তৃণমূলের বিচারে এই বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি শূন্য। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? এক নজরে একবার দেখে নেওয়া যাক এই বাজেটে ঠিক কী বলা হয়েছে—

১। অতিমারির সঙ্গে লড়াইয়ে কর্মসংস্থান যখন একটা খুব বড়ো ব্যাপার বা প্রশ্ন, তখন এবারের বাজেটে আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কৃষির আধুনিকীকরণ ও কৃষকদের উন্নতির জন্যও বাজেটে রয়েছে একগুচ্ছ প্রকল্প।

২। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নতুন ৮০ লক্ষ পরিবারকে ঘর করে দেওয়ারও লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

৩। কোর ব্যাঙ্কিয়ের আওতায় সমস্ত পোস্ট অফিসই আসতে চলেছে। এতে গ্রাহকেরা দারুণ উপকৃত হবেন।

৪। ৩ বছরে ৪০০ নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৫। কর ব্যবস্থা আরও সরলীকরণে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে করদাতাদের সুবিধা হবে এবং সরকারেরও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

৬। উন্নয়ন শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামাঞ্চলেও যাতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য গ্রামে গ্রামে ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় জোর দেওয়া হয়েছে।

৭। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আত্মনির্ভর ভারতের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটেও নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। যেমন— প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য মেক ইন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই বাজেটে বিপুল পরিমাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার।

৮। বাজেটে মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদির দাম কমানোর ইঙ্গিত থাকায় আশা করাই যায় যে অনলাইন পড়াশোনার অনেকটাই সুবিধা হবে।

৯। বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়েরও, যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

১০। ২৫০০০ কিলোমিটার সড়ক তৈরি করার লক্ষ্যমাত্র ধার্য কর হয়েছে এই বাজেটে, এতে পরিকাঠামোর বিপুল উন্নতি ঘটবে। শতকরা ৬৮ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে এই ক্ষেত্রে।

১১। আয়কর রিটার্নের সময়সীমা করা হচ্ছে ২ বছর, থাকছে ভুল সংশোধনের উপায়ও।

১২। এই বাজেটে রাজ্যগুলিকে ১ লক্ষ কোটি টাকার (সুদবিহীন) তহবিলের ঘোষণাও করা হয়েছে।

১৩। মেট্রোরেলের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে বিপুল বরাদ্দ। এর মধ্যে কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য গতবারের তুলনায় কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৪। মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গতবারের তুলনায় বাজেটে অধিক পরিমাণেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৬। প্রধানমন্ত্রী যে PM Gati Shakti-National Master Plan for Multimodal Connectivity-এর সূচনা করেছেন গত বছরে, তা নিয়েও এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, '100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal Logistic facilities will be developed during the next three yars।' সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, ভারত আগামীদিনে এক মহাশক্তিধর উন্নত দেশ হতে চলেছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এবারের বাজেট সেই অর্থে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক বাজেট নয়। প্রকৃত অর্থে দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলাই এই বাজেটের উদ্দেশ্য। সেই দিক থেকে একথা বলাই যায় যে, এবারের বাজেট খুবই বাস্তবসম্মত ও যুক্তির উপরে নির্ভর করেই করা হয়েছে। ◻

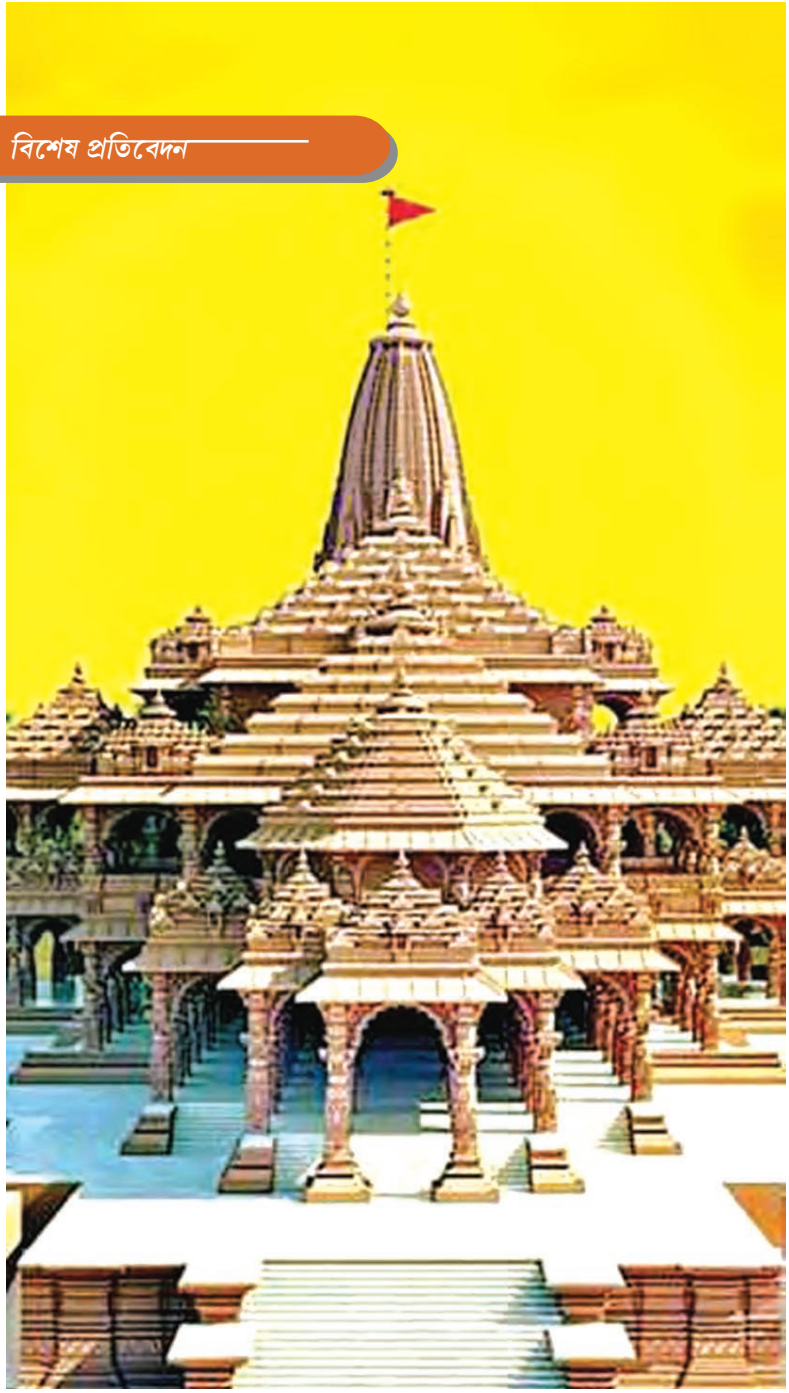

নবরূপে রামমন্দির, নবরূপে অযোধ্যা নগরী

করুণা প্রাকাশ

যদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা।
বেদ পুরাণ বিদিত জগু জানা।।
অবধপুরী সম প্রিয় নহিঁ সোউ।
যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোট।।
জন্মভূমি মম পুরী সুহাবনি।
উত্তর দিসি উয়হ সরযু পাবনি।।
জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াসা।
মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা।।
—রামচরিত মানস (উত্তরকাণ্ড)

অর্থাৎ যদিও সকলে বৈকুণ্ঠেরই গুণগান করে। বেদ পুরাণে উল্লেখ আছে যা জগতে সকলে জানে। তবুও তা অবধপুরীর সমতুল্য নয়। এই বিষয় কিছু লোকেরই মাত্র জানা। জন্মভূমি আমার পুরী অতি মনোরম। যার উত্তর দিকে সরযু প্রবাহিত। যেখানে স্নান করলে বিনা পরিশ্রমে নরগণ আমার সান্নিধ্য লাভ করে। —একথা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজে অযোধ্যা নগরীর বিষয়ে বলছেন।

সেই ত্রেতা যুগ থেকে আজ অবধি অযোধ্যার মাহাত্ম্য অব্যাহত। শ্রদ্ধা, আস্থার কেন্দ্র অযোধ্যা যুগ যুগ আবহমানকাল ধরে। অযোধ্যার প্রাণকেন্দ্র শ্রীরামজন্মভূমি। সুদীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছরের সংঘর্ষের পর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ে কোটি কোটি রামভক্তের শ্রদ্ধা আস্থার কেন্দ্র জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

২০২০ সালে ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে অযোধ্যায় ভূমিপূজনের মাধ্যমে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কাজের শুভারম্ভ হয়েছিল। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে, বাস্তুশাস্ত্র ও স্থাপত্য বিধি মেনে সাধু-সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ভারতের ইতিহাসে সেদিন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলেছে। প্রায় ৫০০ বছরে ৭৪ বার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে প্রায় ৪ লক্ষ রামভক্তের বলিদানের পর রাম ভক্তদের জয় হয়েছে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী আরও একবার তা প্রমাণ হলো।

এখন অব্যাহত গতিতে ২৪ ঘণ্টা নিরন্তর মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। ১২-১২ ঘণ্টার দুই দফায় রাতদিন কাজ চলছে। নবগঠিত শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আওতায় জন্মভূমির ৬৭ একর ভূমির মধ্যে ২.৭৭ একর ভূমিতে মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। মন্দিরের আগের নকশার কিছু পরিবর্তন করে ত্রিতল বিশিষ্ট মন্দিরের নকশা অনুযায়ী কাজ চলছে।

মন্দিরে বাস্তুকার গুজরাটের চন্দ্রকান্ত সোমপুরা মন্দিরের নকশা তৈরি করেছেন। নির্মাণের কাজ 'লার্সন অ্যান্ড টুবরো' কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। 'টাটা কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স' মন্দির নির্মাণের

পরামর্শদাতা রূপে রয়েছে। মন্দির ত্রিতল বিশিষ্ট হবে। প্রত্যেক তলের উচ্চতা ২০ ফুট হবে। মন্দির লম্বায় ৩৬০ ফুট, চওড়া ২৩৫ ফুট, শিখর ১৬১ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হবে।

সমতল থেকে ১৬.৫ ফুট উচ্চতায় মন্দিরের মেঝে থাকবে। নির্মাণ কাজ শুরুর আগে জমির ২০০ ফুট নীচে পর্যন্ত মাটির পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নিকটে প্রবাহিত সরযূ নদীর কথা মাথায় রেখে ১০০০ বছর আয়ু হবে মন্দিরের, সেভাবে কাজ এবং এরকম পাথরের ব্যবহার হচ্ছে। অনুরূপভাবে এরকমই মজবুত ভিত-মেঝে তৈরি হচ্ছে। এবিষয়ে আইআইটি মুম্বাই, দিল্লি, চেন্নাই, গৌহাটি ও রুড়কীর কেন্দ্রীয় ভবন গবেষণা কেন্দ্রের পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

মন্দির নির্মাণে লোহা ব্যবহার করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র পাথরের দ্বারা মন্দির তৈরি হচ্ছে। ৪ প্রকারের পাথর মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিতে কর্ণাটক গ্রানাইট মোট ৭.৫ লক্ষ ঘনফুট। মেঝে এবং দরজায় মকরানা মার্বেল। মন্দিরে বন্সি পাহাড়পুরের বালুয়া পাথর ৪.৫ লক্ষ ঘন ফুট। স্তম্ভ ও চৌকাটে যোধপুর পাথর ৬.৫ লক্ষ লাগবে। এভাবে মন্দির তৈরিতে মোট প্রায় ১৭ লক্ষ ঘন ফুট পাথর ব্যবহৃত হবে।

বর্তমানে ভিতের কাজ চলছে। কর্ণাটক মার্বেল দ্বারা সম্পূর্ণ মন্দিরের ভিত উঁচু করার কাজ চলছে। অত্যাধুনিক মেশিন ও বড়বড় ক্রেন দ্বারা কাজ চলছে। ২০২৩-এর শেষ দিকে গর্ভগৃহে রামলালা বিরাজিত হয়ে যাবেন এরকম পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছে।

নির্মীয়মাণ মন্দির পরিসরের পাশে অস্থায়ী মন্দিরে বর্তমানে রামলালার পূজাঅর্চনা চলছে। ভক্তজনের জন্য দর্শনের সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল ৭ টা থেকে ১১ টা এবং দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। আরতির সময় সকাল ৬-৪৫ মি.। দুপুর ১১-৩০ মি. ভোগ। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যা আরতি, রাত্রি ৭০৩০ মি. শয়ন আরতি। মন্দির ছাড়াও মন্দির পরিসরের ৬৭ একর ভূমিতে যজ্ঞশালা, অনুষ্ঠান মণ্ডপ, গোশালা, প্রদর্শনী, কলাকেন্দ্র, অডিটোরিয়াম আদি থাকবে।

শ্রীরামজন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অযোধ্যার বিকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অযোধ্যা বিকাশ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক কাজ এগিয়েছে। সরযূ নদী তীরে সুন্দর ঘাট বাঁধানো হয়েছে। সরযূ তীরে প্রতিদিন ভজন কীর্তন স্তুতি ও সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে।

অযোধ্যায় দীপাবলীর অনুষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে খুব জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে সরযূ তীরে রামঘাটকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সরযূ নদীর জলধারাকে রামঘাটে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উপস্থিতিতে এক মনোরম ধর্মীয় আয়োজন প্রতিবছর হয়ে আসছে। ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় আলো ধ্বনির অনুষ্ঠান আর্কষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সারা দেশের সঙ্গে অযোধ্যার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য রেল ও সড়ক পথের উন্নতি ও বিস্তারের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। অযোধ্যা রেল স্টেশনকে আধুনিক করার কাজ চলছে। স্টেশনে বুনিয়াদি সুবিধা ছাড়াও যাত্রীনিবাস তৈরি হচ্ছে। ডবল লাইনের কাজ এবং বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে।

সড়কপথকেও উন্নত করা হচ্ছে। ৪ লেন ৬ লেন বিশিষ্ট রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া অযোধ্যা বাইলেনের বিস্তার করা হচ্ছে। বিমান বন্দর তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। অযোধ্যা পঞ্চকোষী পরিক্রমা রাস্তাকেও সুন্দর করে তৈরি করার কাজ চলছে। ধর্মীয় মাহাত্ম্য যুক্ত এই পরিক্রমা পথে গাছ লাগানো, ভক্তদের জন্য বসার স্থান তৈরি, ভক্তদের চলার পথে কষ্ট লাঘব করার জন্য রাস্তাও আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে।

মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কাজও চলছে সমান তালে। অযোধ্যা পুরসভার মাধ্যমেও অনেক কাজ চলছে। শহরের সৌন্দর্যকরণ, পরিকাঠামো ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, আলো, জল ইত্যাদি ব্যবস্থাকেও আধুনিক করার কাজ চলছে। হনুমানগড়ী, কনকভবন, দশরথ মহল, সুগ্রীব কিলা, কার্যশালা প্রভৃতি স্থান দর্শন করতে সারাদেশ থেকে আগত ভক্তদের এই সব ব্যবস্থার ফলে খুব সহজ হবে। খুব শীঘ্রই আমরা শ্রদ্ধা ও আস্থার স্থল অযোধ্যা নগরীকে নবরূপে দেখতে পাব।

আচার্য, কার্যালয় প্রমুখ ও সহযোগী চাই

আচার্য— ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও তদূর্ধ্ব।
অঙ্কন, হাতের কাজ, শিশুশিক্ষার অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন তৎসহ ডি.এল.এড. প্রশিক্ষিত প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকবে।

কার্যালয় প্রমুখ ও কার্যালয় সহযোগী— ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও তদূর্ধ্ব।
বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক ও কমপিউটার জানা প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র কাম্য—

সম্পাদক, সারদা শিশুতীর্থ পরিচালক সমিতি,
সূর্যসেন কলোনী, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০৪

করোনা-ওমিক্রনের আমাদের দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে এত বাড়বাড়ন্তের কারণ কী?

গত ৯ জানুয়ারি ২০২২ একদিনে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড ও ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ হাজার অতিক্রম করেছে। এ বিষেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও হেলদোল আছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না। গঙ্গাসাগর মেলা এবং করপোরেশনের নির্বাচন করাতে বদ্ধ পরিকর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও। গঙ্গাসাগর মেলায় কয়েক লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাবেশ ঘটে যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসেন, পরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সংক্রমণের বৃদ্ধি ঘটাবেন। বহু হিন্দু ধর্মীয় কারণে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নানে অংশগ্রহণ করেন। এদের ধর্মীয় বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ সরকারি নির্দেশ এরা গ্রাহ্য করেনি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা সাধুবাবারা তো জোর গলায় বলছে 'তাদের ধুনির কাছে করোনা ঘেঁসতে পারবে না। তাদের ধর্ম বিশ্বাস এতই প্রবল। একই সঙ্গে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে চারটি করপোরেশনের নির্বাচনী প্রচার। ফলে মিছিল, মিটিং, জনসমাবেশ প্রবল আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে চলেছেন। কেউই নিজেদের কর্মীদের নিরস্ত করতে সচেষ্ট হননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথারীতি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। পুলিশ প্রশাসন অবশ্য মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠে রাস্তায় রাস্তায় পথচারীদের মাস্ক না পরার জন্য ধমকাচ্ছে, যাদের মাস্ক নেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক বিতরণ করছে। কিছু কিছু জায়গায় বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জনসমাবেশ বন্ধ করার জন্য।

এতদ্‌সত্ত্বেও হেলদোল নেই, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের জনগণের মধ্যে। তারা পিকনিক, পার্টি, বেড়ানো, সিনেমা, গানবাজনা প্রভৃতি নিয়ে বড়োই ব্যস্ত। অতি সম্প্রতি পুলিশের তৎপরতায় ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে মাস্কের ব্যবহার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারগুলিতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যেই সচেতনতার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। শাস্তির ভয় না থাকলে কেউই আর সরকারি নির্দেশ মান্য করতে চায় না। এমনকী মান্যগণ্যদের মধ্যেও সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করার প্রবণতা রয়েছে। প্রার্থী নিজে প্রচারে বেরিয়েছিলেন মুখে মাস্ক ছাড়াই, হয়তো পকেটে মাস্ক রয়েছে। প্রশ্ন করলে উত্তর আসবে জনগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সুবিধের জন্যই মাঝে মাঝে মুখ থেকে মাস্ক সরাতে হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় পুলিশকে দেখা গেছে বর্তমান প্রজন্মের মাস্কবিহীন কিছু পথচারীকে রাস্তাতেই উঠবস করাচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে এরা হয়তো কিছুটা সাবধান হবে। তবে জনগণের চৈতন্যোদয় হবে কি সম্পূর্ণভাবে?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

সপ্ত বিন্দুর সমাহার হচ্ছে সিন্ধু

সিন্ধু নদের জন্ম তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে এক ঝরনা থেকে। এরপর সিন্ধুনদ উত্তর-পশ্চিমে উত্তর কাশ্মীর এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ হয়ে অবশেষে আরব সাগরে মিশেছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৯০০ কিলোমিটার।

'সিন্ধু' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। আমরা জানি, বিন্দু মানে ফোঁটা। বিশেষ করে জলের ফোঁটা বা একবিন্দু জল। সিন্ধুনদে বহু নদী এসে মিশেছে। তবে উল্লেখযোগ্য সাত নদী হিসেবে পূর্ব দিক থেকে আসা ঝিলম, চন্দ্রভাগা, রবি, বিপাশা, শতদ্রু এবং পশ্চিমদিক থেকে আসা কাবুল ও স্বাতকে ধরা যায়। আমরা জানি, সুবর্ণরেখা এক নদীর নাম। এখানে রেখাকে নদীর প্রতীক মনে করা হয়েছে। ঠিক এভাবে বিন্দুকে জল বা নদীর প্রতীক মনে করে সপ্তবিন্দু হয়। সপ্তবিন্দুর সমাহার হচ্ছে সিন্দু। উল্লেখ্য, বিন্দুর বিপরীত শব্দ সিন্দু। সহজ কথায় সপ্ত নদীর সমাহার হচ্ছে সিন্দু, উচ্চারণ ভেদে হয়েছে সিন্ধু। উল্লেখ্য, বর্ণমালায় 'দ' ও 'ধ' ধ্বনি দুটি পরপর থাকায় দ ধ্বনি ধ হয়ে গেছে। এই সিন্ধুর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল এক প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতা, যার নাম সকলেই জানি— সিন্ধুসভ্যতা। ঋকবেদে সরস্বতী নদীর মতো সিন্ধু নদের উল্লেখ রয়েছে। তাই সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ বলা যায়।

উল্লেখ্য, উচ্চারণ ভেদে সিন্ধুপারের মানুষ 'হিন্দু' নামে পরিচিত হয়ে যায়। আবার ভূখণ্ড অর্থে হিন্দুস্থান বা হিন্দুস্তান হয়েছে। আবার হিন্দু বা সিন্ধু শব্দ ইউরোপীয় উচ্চারণে ইনডাস বা ইন্ডিয়া হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু, হিন্দুস্থান, ইন্ডাস, ইন্ডিয়া নামের নেপথ্যে রয়েছে সিন্ধু নামটি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

বৈদ্যুতিক মিটার একটি খুড়োর কল

মহান কবি স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের মাধ্যমে জানতে পারি, চণ্ডীদাসের খুড়ো একটি কল বানিয়েছে— যার সাহায্যে যে কোনো ব্যক্তি তিনদিনের পথ একদিনে অতিক্রম করতে পারে। তদ্রূপ, একটি খুড়োর কল পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি আবিষ্কার করেছে। যার দ্বারা গ্রাহকদের আর্থিক তেল নির্গত হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার পাত্রে নিঃশব্দে জমা হচ্ছে মিটারের মাধ্যমে। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে প্রতিমাসে মিটার ভাড়া বাবদ একটি নির্দিষ্ট টাকা আদায় করা হয়, যেহেতু মিটারটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সরবরাহ করেছে। তার গুণমান নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনো প্রশ্নই নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই মিটারটি বিকল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে গ্রাহক জরুরি ভিত্তিতে নতুন মিটরের দাম বাবদ মোটা টাকা বিদ্যুৎ সংস্থাকে জমা করতে বাধ্য হন। অন্যথায় বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় থাকতে হবে। যথাবিধি মিটার ভাড়া ও প্রতিমাসে বিলের সঙ্গে দিতে বাধ্য হন। নিজের মিটারের ভাড়া নিজেই দিচ্ছেন। এ যেন সেই প্রবাদ বাক্য, 'যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙব দাঁতের গোড়া'। এমতাবস্থায় সমস্ত মহান, 'গরিবদরদি, মানবাধিকার কর্মী, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ যাঁদের হৃদয় অষ্টপ্রহর সাধারণ মানুষের জন্য ব্যথিত ও চিন্তিত থাকে সেই সকল মহান আত্মার প্রতি বিনম্র নিবেদন এই খুঁড়োর কল থেকে বের হওয়ার পথ দেখিয়ে বাধিত করবেন। আশাহত না হবার আশা রইল।

—তপন কুমার বৈদ্য,
দমদম, কলকাতা-৭৪।

বুদ্ধদেববাবু : প্রশ্ন তো উঠবেই

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন। উনি রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিরোধীদের কাছেও সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতো মানুষের থেকে এই আচরণ কী আশা করা যায় না!

বাম সমর্থকরা এই ঘটনাটিকে এমন ভাবে প্রচার করছেন যেন মনে হচ্ছে তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন। আর প্রশ্নটা এখানেই। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিতে তিন দশক মন্ত্রী এবং এক দশক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজেকে কি কোনো রাজনৈতিক দলের মন্ত্রী মনে করতেন, নাকি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী। তিনি কি জানেন না যে, কোনো নাগরিক সম্মান কোনো রাজনৈতিক দল দেয় না, দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রপতি দেন। পদ্ম সম্মানকে অস্বীকার করার অর্থ কি দেশের জনগণকে, গণতন্ত্রকে, সংবিধানকে অসম্মান করা নয়!

প্রশ্ন উঠবে, এই আচরণ কী তাঁর প্রতিবাদ নাকি উন্নাসিকতা! ভারতের মধ্যম বাম ও অতি বাম রাজনীতিতে নিম্নবর্ণের নেতা পাওয়া খুব দুষ্কর। বাম নেতারা নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করেন, তাদের হাতে লাল পতাকা তুলে দিয়ে স্লোগান দেওয়ান, কিন্তু তাদের নেতা বানান না। তাই তাদের সিংহভাগ নেতা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি অনগ্রসর বা দলিত বাম নেতা অনুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হবে। এখন প্রশ্ন তো উঠবেই, ব্রাহ্মণ সন্তান বুদ্ধদেববাবুর কি একজন দলিত রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিতে জাত্যভিমানে আটকাচ্ছে!

কয়েক বছর ধরে যা দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তথাকথিত অশিক্ষিত বা জঙ্গলে বসবাসকারী বা রিকশাওয়ালা, যাদের জন্য নন্দন-রবীন্দ্রসদন চত্বরে কোনো স্থান নেই তাদেরও পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। যারা দয়ার পাত্র, তাদের দয়া করা যায়, কিন্তু সম্মান করা যায় কি! তাদের সঙ্গে কি কোনো মঞ্চ একসঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়! এটা কি বুদ্ধদেববাবুরও ভাবনা?

যেদিন সিঙ্গুর থেকে টাটা বিদায় নিল, সেদিন একজন মুখ্যমন্ত্রীর যেমন বিদায়ের সূচনা হয়েছিল, তেমনই সানন্দায় আর একজন মুখ্যমন্ত্রীর উত্থানের বাদ্যি বেজেছিল। তাই, এই প্রত্যাখ্যান কি বুদ্ধবাবুর ব্যক্তিগত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ! যে মানুষটির একদা রাজনৈতিক অভিযানের গতি তরান্বিত করতে বুদ্ধবাবুর পরোক্ষ অবদান ছিল, আজ কি দ্বিতীয়বার ওই মানুষটির রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বাড়ানোর কারণ হতে চান না বলেই বুদ্ধবাবুর এই প্রত্যাখ্যান! অথবা এই প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে ওঠা রাজনৈতিক হাওয়া নিজের দলের পালে লাগাতেই কি সিদ্ধান্ত! পদ্ম সম্মানের মর্যাদা এবং নিজের দলের রাজনৈতিক সুবিধার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেছে নিলে প্রশ্ন তো উঠবেই!

প্রশ্ন উঠবেই, যদি ধরেও নেওয়া হয়, বর্তমানে কেন্দ্র সরকার মানেই বামপন্থীদের অপছন্দের দল, আর উনি সেই দলের বিরোধিতা করছেন। ভারতবর্ষে বাস করলে ভারত সরকার যখন যা দেবে, তা অমৃত হোক বা হলাহল, আপনার বা আমার, পছন্দ হোক বা না হোক, নিতে তো হবেই! সব যখন নেওয়া যাচ্ছে, নিতে হচ্ছে, নিতে হয়, তখন নাগরিক সম্মানে আপত্তি কেন! বুদ্ধবাবুকেও পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ অপছন্দ করতেন। বুদ্ধবাবুকে অপছন্দ করা বা তাঁর দলকে অপছন্দ করার অর্থ তো এটা হতে পারে না তৎকালীন সরকারের দেওয়া যে কোনো কিছুকেই অস্বীকার করতে হবে! অন্তত ভারতবর্ষে যে কোনো সরকার গণতন্ত্রের প্রতিফলন, ব্যক্তিগত আবেগের অনেক ঊর্ধ্বে গণতন্ত্রের মর্যাদা, যা এক সময় সোমনাথবাবু দেখিয়েছিলেন তা বুদ্ধবাবুর থেকেও কি আশা করা উচিত নয়!

গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদের অধিকার থাকে— কিন্তু সে অধিকার যেন সাংবিধানিক কাঠামোতে আঘাত না আসে! আজ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ তাদের সংবিধানে এই গণতন্ত্র শব্দটাকে আনার জন্য অথবা তাকে বজায় রাখার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ করছে। আর আমরা এই গণতন্ত্র ফ্রি-তে ভোগ করছি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিভিন্ন দল ক্ষমতায় এসেছে, চলেও গেছে; আজ কেউ আছে, কাল হয়তো অন্য কেউ আসবে! কিন্তু এই দেশ থাকবে, সংবিধান থাকবে, গণতন্ত্র থাকবে, আর স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের স্বাভিমানের প্রতীক হয়ে থাকবে পদ্ম সম্মান।

পদ্ম সম্মান কেউ প্রত্যাহার করলেই পদ্ম সম্মানের মর্যাদা কমবে না। তিনি এই সম্মান নিলে কাগজে হয়তো এক কলম খবর হতো, অথবা চ্যানেলে ৩০ সেকেন্ডের একটা কোলাজ চলত। আর তাঁর প্রত্যাখ্যানে বাঙ্গলার সংবাদমাধ্যম হয়তো বড়োজোর তিন-চারদিন গা গরমের উপকরণ পাবে। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী যিনি সরকারকে দলের সমান্তরালে চালানোর সাহস দেখিয়েছিলেন, যিনি উন্নয়নকে ম্যানিফেস্টোর উপরে রেখেছিলেন, যার ভাষায় ও আচরণে বরাবর সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর শ্রদ্ধাশীল মনে হয়েছে, তাঁর এই আচরণ অবশ্যই স্ববিরোধী ও অস্বস্তিকর। এবং এমন আচরণে প্রশ্ন তো উঠবেই!

—প্রসেনজিৎ চৌধুরী,
নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

হাতে বোনা মাফ্‌লার ও টুপিতে থাকে আন্তরিকতার ছোঁয়া

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের জীবনের পথে চলতে চলতে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের ভূমিকা থাকে। জিনিসগুলি প্রায় সব হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এমনকী এখনো কোনো কোনো মহিলা নিজের হাতে প্রিয়জনদের জন্য শীতবস্ত্র বানিয়ে থাকেন। অর্থ দিয়ে এর মূল্যায়ন হয় না, এগুলি অমূল্য। আবার বাড়িতে বানানো বড়ি, পাঁপড়, আচার, চাট্‌নি এমনকী রান্নার বিভিন্ন পদের সামনে বাজারলব্ধ দ্রব্যগুলি কেমন যেন ফিকে মনে হয়। কাজের চাপ কমাবার জন্য বা সময় বাঁচাবার জন্য আমরা অনেকেই বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বাস্তবে সত্যিই কি আমরা সময় বাঁচাচ্ছি? তাহলে প্রতিদিন কত সময় আমরা টিভি, মোবাইলে ব্যয় করি? নিজেদের দিনচর্যার মধ্য থেকে একটি ঘণ্টাও সময় যদি বের করতে পারি প্রিয়জনদের জন্য, তাহলে আমাদের সৃজনশীলতা ও আন্তরিকতার স্ফুরণ হবে। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ওই স্নেহ স্পর্শের দ্বারা আরও দৃঢ় হবে। পারম্পরিক শিল্পগুলি নতুন প্রজন্মের কাছেও সহজলব্ধ হবে এবং তারা সেগুলি ধরে রাখার চেষ্টা করবে।

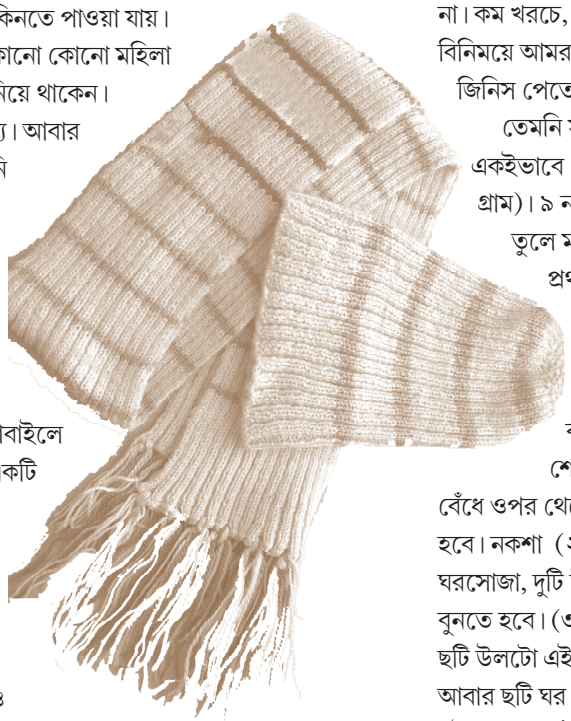

প্রতি বছর শীতকালে আমরা সব থেকে বেশি ব্যবহার করি টুপি ও মাফলার। বছরে প্রায় চার-পাঁচ মাস ওগুলির প্রয়োজন হয়। আমরা যারা খুব সামান্য বুনতে পারি, তারাও অতি সহজে ও অল্প সময়ে এগুলি বানিয়ে ফেলতে পারব। প্রথমে আসা যাক, উল প্রসঙ্গে। বাজারের অনেক পশমবস্ত্র খড়খড়ে হয়, কোনোটা-বা ভীষণ কুটকুটে। উল ভালো না হলে এই সমস্যা হয়। সেজন্য যখন উল কিনব তখন উলের বল বা লেছিটি নিজের গালে ঘষে দেখব, খড়খড়ে বা কুটকুটে হলে সহজেই বুঝতে পারব। নরম, মোলায়েম ও ওজনে হালকা উল নিতে হবে। বেবি-উল নরম, মোলায়েম হয়, তবে অত্যধিক সরু হবার জন্য বুনতে অনেক সময় লাগে। এক্ষেত্রে ভালো কোম্পানির একটু মোটা উল (দুই তিন সেন্টিমিটার) নেওয়া যেতে পারে। এগুলি আরামদায়ক ও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

এবার মাফলার প্রসঙ্গে আসা যাক। এক রং বা বিভিন্ন রঙের উল দিয়ে বানানো যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন দুটি ৮ নম্বর কাঁটা ও ২০০ গ্রাম মতো উল। একটু বেশি উল নেওয়া ভালো, এতে কম পড়ার চিন্তা থাকে না, আর একটু বেশি হলে অন্য কিছু বানানো যেতে পারে। প্রথমে ৮ নম্বর কাঁটায় ৬৫টি ঘর তুলব, একটু ঢিলে হাতে বুনব। এর পরের কাঁটা থেকে প্রথমে দুটো সোজা, দুটো উলটো, শেষ ঘরটি সোজা বুনে শেষ করব। দ্বিতীয়, তৃতীয় সব কাঁটা একই ভাবে বুনে নেব। এভাবে প্রায় সোয়া মিটার বুনে ঘর বন্ধ করব। দুটি প্রান্তে তিন-চার ইঞ্চি উলের ঝালর বানাবো। এটি খুব আরামদায়ক— মাথা, গলা, বুক ঢেকে রাখবে। প্রয়োজন মতো টেনে চওড়া করাও যাবে। বুনতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। এই মাফলার বানিয়ে ব্যবহার করলে অনুভব করতে পারব যে এমন জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না। কম খরচে, কম সময়ে, কম পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারি, যা অমূল্য!

তেমনি সহজ টুপি বানানো। উল একইভাবে বেছে নেব (৭০ থেকে ১০০ গ্রাম)। ৯ নম্বর কাঁটায় ১২০টি ঘর তুলে মাঝারি হাতে বুনতে হবে। প্রথমে পটি— তিনটি ঘর সোজা, তিনটি উলটো, এইভাবে লম্বায় প্রায় ৮ ইঞ্চি বোনার পরে ঘর বসাতে শুরু করতে হবে। শেষের চার-পাঁচটি ঘর টেনে বেঁধে ওপর থেকে নীচে সেলাই করতে হবে। নকশা (২) প্রতিটি কাঁটায় দুটি ঘরসোজা, দুটি উলটো করে সব কাঁটা বুনতে হবে। (৩) নকশা ছটি ঘর সোজা, ছটি উলটো এই ভাবে ছয় কাঁটা বুনে আবার ছটি ঘর উলটো ছটি ঘর সোজা এইভাবে ছয় কাঁটা বুনতে হবে। খুবই সহজ। সময় লাগবে ৩ ঘণ্টা মতো। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জন্য প্রয়োজনীয় ও অতি সুন্দর টুপি আমরা নিজেরাই বানাতে পারি।

আন্তরিকতার স্পর্শে ও নিজের হাতের যত্নে তৈরি পোশাকটি সবার প্রিয় হয়ে উঠবে। আমরা যেটুকু হাতে করে প্রিয়জনের সামনে তুলে ধরতে পারি, সেখানে বাজার থেকে নাই-বা কিনে আনলাম। মায়েদের আন্তরিকতায়, উষ্ণতায় ভরে উঠুক পরিবার, সমাজ, দেশ। একটুকু প্রচেষ্টা করতেই পারি। এছাড়া, আরও অনেক প্রাপ্তিযোগ হবে, যা থাকবে কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রীর মনের মণিকোঠায়!

নিয়মিত ব্যায়াম না করলে ডায়াবেসিটি হতে পারে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

সাম্প্রতিক সময়ে ওবেসিটি একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটো থেকে বড়ো নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই রোগের শিকার হচ্ছেন। 'ওবেসিটি' বা স্থূলতা এমনই একটি রোগ যা অনেক রোগের বীজ বহন করে আনে। যেমন 'ওবেসিটি' বা স্থূলতা সহজ, সরল সাবলীল জীবনযাপনে একটা ছন্দপতন ঘটায়। যে রোগে মানবদেহের ওজন বৃদ্ধি পায়, সেই রোগকেই বলা হয় 'ওবেসিটি'। 'ওবেসিটি' রোগটির পিছনে বেশ কিছু কারণ দায়ী। চিকিৎসকের মতে, জেনেটিক অর্থাৎ বংশগত কারণ হলো একটি মুখ্য কারণ। পরিবারের যদি কেউ ওবেসিটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এছাড়া আরও কিছু কারণও মুখ্যত দায়ী। কায়িক পরিশ্রমের অভাব, নিয়মিত ব্যায়াম না করলে এই রোগ হতে পারে। পরিশ্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ করা চলবে না। কেন না তা ওবেসিটির কারণ।

ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিঙ্কস (যেমন কোকা কোলা) প্রভৃতি মাত্রাতিরিক্ত খেলে ওবেসিটি রোগ হওয়ার পথ প্রশস্ত করে। যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে তারাও বিশেষভাবে ওবেসিটিতে আক্রান্ত হয়। 'হরমোনাল ইমব্যালেন্স' হলো ওবেসিটি রোগের একটি মূল কারণ।

রোগের লক্ষণ : মানবদেহে বিএমআই ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে থাকলে বলা হয় তা নর্মাল। কিন্তু যদি তা ২৭-এর বেশি হয়ে যায় তবে ওবেসিটির সম্ভাবনা থাকে। বিএমআই যদি ৪০ এবং তার বেশি হয় তবে সেক্ষেত্রে বেরিয়াট্রিক সার্জারির প্রয়োজন পড়ে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ দেহের বিএমআই বেড়ে যাওয়া। ওজন বেড়ে যায়। হাঁটতে পারে না। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ওবেসিটি রোগে শরীরে অলসতা ভাব বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই রোগে ডিপ্রেশন ও মানসিক অবসাদে ভুগতে হয়। জেদ বা একগুঁয়েমি বেড়ে যায়।

ওবেসিটি রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্যানসার বা কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহু গুণ বেড়ে যায়। ওবেসিটির রোগীরা ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। ডায়াবেটিস ও ওবেসিটি রোগে একসঙ্গে আক্রান্ত হলে তাকে 'ডায়াবেসিটি' বলা হয়। ওবেসিটি রোগের হার্ট অ্যাটাক, অস্টিওআর্থারাইটিসের মতো দুরারোগ্য রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই রোগে কিন্তু খারাপ হরমোনগুলি বেশি মাত্রায় নিঃসৃত হয় এবং ভালো হরমোনগুলি তুলনামূলকভাবে কম নিঃসৃত হয়। ফলে রোগীর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শরীরে হরমোনাল ইমব্যালেন্স সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি : ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী বিএমআই যদি ৩৭.৫ হয় এবং তার সঙ্গে দুটো অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ যেমন-- থাইরয়েড এবং বাত প্রভৃতি থাকলে এবং বিএমআই যদি ৪০ বা তার বেশি থাকে তবে এই বিএমআই বেরিয়াটিক সার্জারি করা অবশ্য প্রয়োজন। ইন্ডিয়ান গাইডলাইন অনুযায়ী, বিএমআই যদি ৩২.৫ এবং তার সঙ্গে যদি থাইরয়েড বাত জাতীয় রোগ থাকে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের মতে 'বেরিয়াট্রিক সার্জারি' একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : এই রোগ প্রতিরোধ করার একমাত্র চাবিকাঠি হলো, লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন। নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। চিকিৎসকের মতে, প্রতিদিন চল্লিশ মিনিট করে এবং সপ্তাহে পাঁচদিন করে নিয়মিত এক্সারসাইজ করা উচিত।

যে কোনও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য বর্জন করা উচিত। মানসিক স্ট্রেস অর্থাৎ চাপ কমানো উচিত। শরীরে ক্যালোরি ব্যালেন্স মেইন্টেন করা অবশ্য কর্তব্য। ধূমপান ও অ্যালকোহল পান অবশ্যই বর্জন করতে হবে। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে রোগ অনুযায়ী উপযুক্ত ডায়েট চার্ট করে নেওয়া উচিত। এগুলি করলে রোগ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। ডায়াবেসিটি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিংবা প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত। যথা—

১. ডায়াবেসিটি মিয়মিত চেক-আপ। ২. লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। ৩. রোগ সম্পর্কে সঠিক ও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা। ৪. নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন। ▯

ঠুনকো সম্পর্কের প্রদর্শন ভ্যালেন্টাইন্স ডে

অনামিকা দে

১৪ ফেব্রুয়ারি। এ যেন প্রেম প্রেম খেলা। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি যুবক হঠাৎ একদিনের জন্য শেক্সপিয়ারের রোমিও মন্টাগুয়ে— ট্র্যাজিক হিরো। যার ট্র্যাজেডি এটাই যে সে ওই একদিনের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রেমিক হতে চায় আর যা হতে গিয়ে পকেট ফাঁকা করে প্রেমিকার পছন্দের শ্রেষ্ঠ গিফট্ কিনে ফেলে। যেন সব কৃতিত্ব ওই গিফটেই লুকিয়ে আছে। আর্চিস গ্যালারির কার্ডের শুকনো ভালোবাসাময় লেখায় এখন আর মন ভরছে না, তাই লম্বা লাইন জুয়েলারির শোরুমে। যে যত দামি গিফট্ দেবে তার ভালোবাসা তত দামি। ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারি মাস এলেই তাই বুক দুরু দুরু। কিন্তু এই 'ভ্যালেনটাইন্স ডে' নিয়ে আদিখ্যেতা করা বাঙ্গালির কাছে প্রশ্ন, ইংরেজি 'লাভ ডে'-তে ভালোবাসা খুঁজতে গিয়ে বাঙ্গালির লাভ কিছু হচ্ছে নাকি সবটাই লোকসান? পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় আজকের প্রজন্মের এক শ্রেণী, যারা প্রকাশ্যে প্রেম বিনিময়কে আধুনিকতার চূড়ান্ত মনে করে শালীনতাবোধের সীমা ছাড়াচ্ছে। গভীরতাহীন অস্থায়ী সম্পর্কের 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' হিসেবে একে অপরকে গিফট দিচ্ছে, হারাচ্ছে সম্পর্কের মূল্যবোধ। এ কী হলো বাঙ্গালির? যাঁদের আরাধ্য প্রেমের দেবতা 'রাধা-কৃষ্ণ', জন্ম জন্মান্তরের যুগল প্রতীক। যেখানে ভালোবাসা পবিত্র, ঈশ্বর সাধনা সম, আজ একবিংশ শতাব্দীতে ভালোবাসা কি এতটাই ঠুনকো হয়েছে যে তাকে পালন করতে হলে একটি বিশেষ দিন প্রয়োজন?

মান্না দের গাওয়া একটি বিখ্যাত গান, 'যদি কাগজে লেখো নাম' গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানের একটি লাইন খুব মনে পড়ছে, 'গভীর হয় গো যেখানে ভালোবাসা, মুখে তো সেখানে থাকে না কোনো ভাষা।'

পাশ্চাত্য কালচারে ভালোবাসার 'ডে' পালন নিয়ে বাঙ্গালির যে বাড়াবাড়ি, সমাজের বিশিষ্ট জনেরা কীভাবে দেখছেন, আসুন একবার তাঁদের মুখ থেকেই জেনে নিই।

অনিন্দ্য চ্যাটার্জি,

প্রসিদ্ধ তবলাবাদক

আমার ব্যক্তিগত মত, ভালোবাসা কোনো 'একটি' দিনের ভাবনা হতে পারে না, সে তো প্রতিদিনের। হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে 'ভালোবাসা'টা দেখানো অনেক আবেগের ওপর নির্ভরশীল, যেমন ওরা প্রকাশ্যে কিস্ বা হাগ্ করে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি পরম্পরা কখনোই সেটা বলে না। যদিও ইদানীং সেই প্রভাবই দেখা যাচ্ছে খোদ কলকাতার বুকে। প্রকাশ্যে রাস্তায় আলিঙ্গন বা চুম্বন এখন যেন আধুনিক মনস্কতার পরিচায়ক।

ছেলে-মেয়েরা আজকাল বড্ড বেশি খোলামেলা। আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙ্গালি তো চিরকালই ভালোবাসার দিন পালন করেছে। ভাইফোঁটায় ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা— এতো বাঙ্গালির চিরন্তন ভালোবাসা। তার জন্য ঘটা করে প্রেমদিবস পালন আমরা কেন করব।

তাই আমি মনে করি আলাদা করে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালনের মাধ্যমে প্রেমদিবস পালন আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে কখনোই কাম্য নয়।

লোপামুদ্রা মিত্র,

বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী

বাঙ্গালি চিরকালই অন্যের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পছন্দ করে। এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তো এমনিতেই ঢুকছে। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে ইদানীং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির পর্যায় চলে গিয়েছে বাঙ্গালি। যদিও সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কারণেই এর বাড়বাড়ন্ত। আমি মনে করি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন— একটি নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। রুচিহীন বাড়াবাড়ি, আসলে মানুষের সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অবনমন এর জন্য দায়ী। বাঙ্গালির চারিত্রিক দৃঢ়তার স্খলন ঘটেছে তাই আজ অন্যের নকল করতে করতে এই অবস্থা। এর প্রভাব শুধু অকারণে প্রেম দিবস পালনেই আবদ্ধ নেই, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমাজের সকল স্তরেই পড়েছে। প্রকৃত শিক্ষার অভাব এর কারণ বলে মনে করি। সব থেকে হাস্যকর, যারা ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে মাতামাতি করছে তাদের বেশিরভাগই জানে না এর অর্থ, কেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ওই দিন পালিত হয়। কে ছিলেন পাদরি ভ্যালেন্টাইন, জানে না ওরা, তাই ভালোবাসাহীন ভালোবাসার দিবস পালন করে 'ভালোবাসা'টাকে নষ্ট করে।

সরস্বতী পূজাই বাঙ্গালির প্রেমের সহজ সমাধান। সরস্বতী পূজাই সেইদিন, যখন মেয়েদের স্কুলের দরজা সকলের জন্য খোলা। ছেলেরাও এইদিন মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে পারে। সরস্বতী পূজা হয়ে ওঠে বাঙ্গালির অঘোষিত প্রেম দিবস।

বাঙ্গালির প্রেম দিবস এবং প্রেম-ভাবনা

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

কৈশোরের ধর্ম আকৃষ্ট হওয়া আর যৌবনের ধর্ম প্রেম। প্রেম হলো জীবনের সর্বোত্তম লীলা। কারণ মানুষের জীবনে বেশিরভাগ সম্পর্কই জন্মগত ভাবে পাওয়া। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একটি শিশু বাবা, মা, ভাই-বোন, মামা, কাকা, মাসী, পিসি ইত্যাদি বহু সম্পর্ক পায়। এর জন্য তাকে বাড়তি কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। প্রেমের সম্পর্কই এমন একটা সম্পর্ক যেটা মানুষকে খুঁজে বের করতে হয়। সঠিক সঙ্গী নির্বাচন মানুষের জীবনকে গুছিয়ে তুলতে পারে আবার সঙ্গী বাছতে ভুল হলে সেই জীবনই বিষের ঝাড় হয়ে ওঠে। তবে সঙ্গী শুধু নির্বাচন করলেই হয় না, সঙ্গীর সঙ্গে সেই সম্পর্ক সারা জীবন টিকিয়ে রাখার বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হয়। আর এই বিদ্যাই হলো প্রেম। সেই কারণেই প্রেমলীলা কোনো ছেলেখেলা নয়। প্রেম করার কোনো ধরাবাঁধা সূত্র বা তত্ত্বও হয় না। তাই রূপে কার্তিক আর গুণে গণেশ হলেই যে সে সার্থক প্রেমিক হবে, একটি সুখের সংসার পাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। লৌকিক বাংলা প্রবাদেও এর কিছু প্রমাণ মেলে। কথায় আছে— 'অতি বড়ো সংসারী না পায় ঘর, অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর'।

তবে প্রেমের আসল মজা কিন্তু এটাই। প্রেম করলেই সাফল্যের গ্যারান্টি না থাকাটাই সব থেকে বড়ো রোমাঞ্চ। শেষে কী হবে তার সবটুকু যদি আগে থেকেই জানা থাকে, তাহলে তো মজাই নষ্ট। প্রেমের আকর্ষণও ঠিক এই কারণে। প্রেমকে পুঁজি করে তৈরি হয়েছে গান, লেখা হয়েছে নাটক, কবিতা, বানানো হচ্ছে সিনেমা। এমনকী সেই আদ্যিকাল থেকে বাঙ্গালির ধর্মভাবনাতেও মিশে রয়েছে প্রেম। হর-পার্বতীর প্রেমকথা, তাঁদের সংসার নিয়ে বাংলায় অজস্র কাব্য, গল্প, গান, উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজাও তো শিব-দুর্গাকে সপরিবারে আরাধনা। বাঙ্গালির আদর্শ পরিবার তো চার সন্তান-সহ হর-পার্বতী। আর সেই কারণেই শিবরাত্রি অর্থাৎ শিব-দুর্গার বিয়ের দিন বাকি ভারতের মতো বাঙ্গালি মেয়েরাও শিবের মাথায় জল ঢেলে কামনা করে শিবের মতো বর।

প্রেমের আরাধনায় পিছিয়ে নেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও। তাদের সাধনার মূল স্তম্ভই হলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমরস। বৈষ্ণব পদাবলীতে অত্যন্ত বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগাথা। শুধুমাত্র রাধারানির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শরীরী প্রেম দেখানোর কারণে আজকাল অনেক 'অতি বিশুদ্ধতাবাদী' পদাবলী সাহিত্যকে পত্রপাঠ বাতিল করে দেন। তারা ভুলে যান, মহাকবি কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবের মূল বিষয়ও হলো শিব-পার্বতীর শরীরী প্রেম। যে যুক্তিতে পদাবলী বাতিল করা যায় সেই একই যুক্তিতে কালিদাসও মিথ্যে হয়ে যান। আর হিন্দুর কাছে জীবনের সকল প্রেরণার উৎস তো তার দেব-দেবী। যুদ্ধের আদর্শপুরুষ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিশূলধারী মহাদেব আবার প্রেমের আদর্শ বংশীধারী কেষ্ট ঠাকুর, পার্বতীর প্রেমে মগ্ন মহাদেব। এই কারণেই দেবদেবীদের প্রেম, সংসার জীবন ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে বাংলায় বহু যাত্রাপালা, কবিগান ইত্যাদি রচিত হয়েছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে কী করা উচিত, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কেমন হবে, সম্পর্কের মান-অভিমান কীভাবে নিরসন হবে; এরকম নানা বিষয়ে লোকশিক্ষার বিস্তার ঘটায় এই পালাগুলি।

যেমন, শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন। বাঙ্গলার অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রাপালা। এর মূল বিষয় হলো রাধারানি শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার অভিমান ভাঙাচ্ছেন। কারণ সংসার ধরে রাখতে, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এগুলো অত্যন্ত দরকারি গুণ। আবার 'যুবতী রাধে' কীর্তন

গানের মূল উপজীব্য বিষয় হলো প্রেম প্রত্যাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে প্রেম প্রস্তাব দিচ্ছেন আর রাধিকা নানান যুক্তি সাজিয়ে সেই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে রাধারানিকে প্রেমে রাজি করালেন, সেটা নিয়েই এই গান। আজকের এই সমাজে যখন প্রতিনিয়ত হিন্দুদের সংসার ভাঙছে, দাম্পত্য কলহ কিংবা মান অভিমান ডিভোর্সের রূপ নিচ্ছে, হিন্দু পুরুষের প্রেমে আনাড়িপনার সুযোগ নিয়ে নির্বোধ হিন্দু মেয়েদের ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অহিন্দু পুরুষ; তখন যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ নয়, প্রেমিক কৃষ্ণকেই দরকার। কারণ সংসার না টিকলে সমাজ থাকে না। আর যে ধর্মের নিজস্ব সমাজই ধ্বংস হয়ে গেছে সে কার সঙ্গে কীসের জন্য লড়বে? সংসার রক্ষার জন্য খড়্গ, ত্রিশূল কিংবা চক্র নয়, সংসার রক্ষার জন্য চাই প্রেমের মাধুর্য। আর সেই প্রেমশিক্ষার আকর গ্রন্থই হলো কালিদাসের কুমারসম্ভব কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য।

প্রেমের ধারণা যেমন বাঙ্গালি ধর্ম থেকে পেয়েছে, সেরকমই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই বাঙ্গালি নিজস্ব প্রেম দিবস খুঁজে নিয়েছে। এই প্রেম দিবস বাঙ্গলার একেক জায়গায় একেক রকম। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় যেমন টুসু পূজার অন্যতম আকর্ষণ পুজোর শেষে নদীর পাড়ে নারী-পুরুষের জড়ো হওয়া। একে অপরকে লক্ষ্য করে ছড়া কেটে কথা বলা। নিজের জীবনের ইচ্ছা, চাহিদা সবকিছু ছন্দে বেঁধে ব্যক্ত করা। এই ছড়ার মাধ্যমেই একে অপরকে প্রথম জানা। এইভাবেই প্রেমের সূচনা।

আর যেখানে টুসু নেই, সেখানে আছে দোলযাত্রা। সারা বছর সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ কিশোর-কিশোরীর দল রঙের আড়ালে দিব্যি দোল খেলতে পারে পছন্দের মানুষটির সঙ্গে। পূজা যখনই উৎসব হয়ে ওঠে, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, প্রেমিক প্রেমিকাকে এক করে দেয়। এইভাবেই গত কয়েক দশকে সরস্বতী পূজা হয়ে উঠেছিল বাঙ্গালির অঘোষিত প্রেম দিবস। তখনও স্কুলগুলো কো-এড ছিল না। ছেলেরা ছেলেদের স্কুলে আর মেয়েরা মেয়েদের স্কুলেই পড়ত। আর মেয়েদের স্কুলের দরজা তো ছেলেদের জন্য বন্ধ। তো এই অবস্থায় প্রেম পরিণতি পাবে কী করে? এখানেও রাস্তা দেখালো সেই ধর্ম। সরস্বতী পূজাই হয়ে উঠল বাঙ্গালির প্রেমের সহজ সমাধান। সরস্বতী পূজাই সেইদিন, যখন মেয়েদের স্কুলের দরজা সকলের জন্য খোলা। ছেলেরাও এইদিন মেয়েদের স্কুলে ঢুকতে পারে। আবার এইদিনে প্রায় সব ছাত্রীই একবারের জন্য হলেও স্কুলে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একা কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে। ফলে গার্জেনের চোখ এড়িয়ে একটি ছেলের পক্ষে খুব সহজেই মেয়েটির কাছে প্রেম প্রস্তাব পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। এইভাবেই অসংখ্য বাঙ্গালির প্রেম শুরু হয়েছে এবং সাফল্য পেয়েছে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে এতগুলো দিনের মধ্যে কোন দিনটাকে আমরা প্রেম দিবস বলে মানব? টুসু পূজা, দোলযাত্রা, নাকি সরস্বতী পূজা? কিন্তু পশ্চিমি দেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একটাই দিনকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা প্রেম দিবস হিসেবে মানা হয়েছে বলেই যে আমাদেরও শুধু একটাই দিন বাছতে হবে এমন তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একের বেশি প্রেম দিবস থাকলে ক্ষতি কী? হিন্দু ধর্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম। ন্যায় রক্ষায় অস্ত্র ধরার কথাও বলে, আবার সংসার গড়তে প্রেম করারও পরামর্শ দেয়। কারণ অস্ত্রের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার কোনো বিরোধ নেই। যে রাঁধে সে যেমন চুলও বাঁধে; তেমনই যে হাত অস্ত্র সাজায়, সেই হাত বাঁশিও বাজায়। □

প্রেমহীন প্রেমদিবস পালনে মত্ত ওয়াই জেনারেশন

সুকল্প চৌধুরী

এমন অনেক 'দিন' আছে যা কিনা ইউরোপ বা আমেরিকার সামাজিক সংস্কৃতি। যা কিনা একান্তই তাদের বিষয়। কিন্তু ভারতের তথাকথিত আধুনিকতার চিন্তা ভাবনার পথে চলা এই প্রজন্ম পশ্চিমের সেইসব সংস্কৃতির ভালোটা না নিয়ে খারাপটাই নিয়েছে। তারই চরম উদাহরণ হলো ভ্যালেনন্টাইন্স ডে'র কদর্য দিকগুলি গ্রহণ করা। সকলের কাছে দিনটি প্রেমদিবস হিসেবেই পরিচিত। সেই প্রেম দিবস এখন এই প্রজন্মের অনেকেরই কাছে প্রকাশ্যে বেলাল্লাপনার অশালীন প্রদর্শন মাত্র। বাইরের আচরণে অতি আধুনিক এবং মানসিক ভাবে চূড়ান্ত অশিক্ষিত আজকের প্রজন্মের একাংশের কাছে প্রেম দিবস প্রকাশ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির ছাড়পত্র হিসেবে এসেছে। পাশাপাশি পার্কে বা একটু আড়ালে প্রেমের আস্বাদ স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হয় তাদের কাছে। প্রেম দিবসে প্রেমিকের উপহার যত দামি স্বেচ্ছারিতার বাঁধন তত হয় আলগা। এর ভেতর আর যাই থাক ভালোবাসা নেই। প্রেমহীন প্রেম দিবস পালন হলো ওয়াই জেনারেশনের কাছে চরম আধুনিকতা। কেউ এই স্বেচ্ছাচারিতাকে অপছন্দ করলেই মধ্যযুগের মানসিকতা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। বেলেল্লাপনা অপছন্দের মানুষেরা সংবাদপত্রে 'নীতি-পুলিশ' বলে চিহ্নিত। প্রেম দিবসের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে, বলা ভালো সামাজিক অশোভন এই বিষয়টিকে কিছু বাজারি পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল ইন্ধন দিয়ে চলেছে। তথাকথিত ওয়াই জেনারেশনের এই ধরনের বেলাল্লাপনা হামেশাই অনেকের চোখে পড়ে।

তবে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে আদৌ প্রেমদিবস চিহ্নিত করা উচিত নয় বলে মনে করেন অনেক ইউরোপীয়ো পণ্ডিত। তাঁদের কাছে এই দিনটি রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে পাহাড়প্রতিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম একক লড়াইয়ের দলিল এই দিনটি। একই সঙ্গে ভালোবাসার এক করুণ পরিণতিরও দিন। এই লড়াইয়ের ইতিহাস সবাই জানেন। তৃতীয় শতকের আগে থেকেই রোম সাম্রাজ্য সামরিক শক্তিতে প্রথম স্থানে উঠে আসে। আনুমানিক ২৩৮ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লোডিয়াস সিংহাসনে বসার পর সামরিক শক্তির শিখরে ওঠে ইউরোপের এই দেশটি। স্পেন ও এশিয়া লাগোয়া দু-একটি দেশ ছাড়া সেই সময়কার গল এখনকার ফ্রান্স, ইংল্যান্ড-সহ গোটা ইউরোপ রোমের দখলে আসে। বলা হয় অসীম সাহসী ক্লোডিয়াস নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। একবার রোম সম্রাট সাধারণ সৈন্য, সেনা আধিকারিক, দেশের সামন্ত ও পদস্থ কর্মচারীদের ভেতর সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পারেন বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতরা শারীরিক শক্তিতে ও বুদ্ধিমত্তায় অনেক এগিয়ে। অবিবাহিত সেনারা যুদ্ধজয়ে অগ্রণী। যুদ্ধে এই অবিবাহিত সেনারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। একই ভাবে অবিবাহিত রাজকর্মচারীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এই সমীক্ষার ফল হিসেবে ক্লোডিয়াস ফরমান জারি করে জানিয়ে দেন কোনও সৈন্য, সেনা আধিকারিক, রাজ কর্মচারী,

রাজপদস্থ কর্মী বিবাহ করতে পারবে না। এদের ভেতর কেউ বিবাহ করলে তা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকী বিবাহের পক্ষে প্রচারও করা যাবে না। ইউরোপে বিশেষ করে রোমে প্রথম থেকেই সাধারণ মানুষের ভেতর চার্চের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ক্লোডিয়াস চার্চকে নির্দেশ দেন পোপ ও পাদরিদের এই ফরমান নিয়ে প্রচার করতে হবে। রাজশক্তির ভয়ে ও উৎকোচের বিনিময়ে দেশের প্রায় সমস্ত চার্চ ক্লোডিয়াসের ফরমান প্রচার করতে শুরু করে। বাকিরা নীরব ছিল। তবে রোমের পশ্চিম দিকে ভিটানিকার গ্রামের চার্চের তরুণ পাদরি ভ্যালেনটাইন এই ফরমান মানতে চাননি। তিনি বিরুদ্ধমত প্রচার শুরু করেন। তাঁর মতে বিবাহ প্রতিরোধ হলে মানব জাতির বিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে। যা কিনা ঈশ্বর বিরোধী। কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে ভিটানিকা চার্চের প্রধান পোপ ডেপিয়েক ল্যামিনি তাঁকে বহিষ্কার করেন। এরপর ভ্যালেনটাইন পায়ে হেঁটে, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ক্লোডিয়াসের ফরমানের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

স্বাভাবিকভাবে কিছুদিনের ভেতর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্টোজিয়ান শহরের কারাগারে তাঁকে আটকে রাখে রোম সেনা। ভ্যালেনটাইনের ঈশ্বর ভক্তি, সুমধুর ব্যবহার ও পাণ্ডিত্য কারাগারের প্রধানকে মুগ্ধ করে। কারাপ্রধানের মেয়ে ছিলেন অন্ধ। ভ্যালেনটাইন কারাপ্রধানের অনুরোধে তাঁর মেয়ের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। যে কোনও কারণেই হোক কারাপ্রধানের মেয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ধন্যবাদ জানাতে কারাপ্রধান ও তাঁর মেয়ে কারাগারে ভ্যালেনটাইনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বাবার সঙ্গে প্রায় নিয়মিত কারাগারে আসতেন কারাপ্রধানের মেয়ে। কিছুদিন দেখা সাক্ষাতের পর ভ্যালেনটাইন ও কারাপ্রধানের মেয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা বিয়ে করবেন বলে স্থির করেন। রোম সম্রাট সব জানতে পেরে ভ্যালেনটাইনকে নির্দেশ দেন বিবাহ না করতে এবং বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার করতে। কিন্তু তিনি এই ফরমান মেনে নিতে রাজি হননি। ক্লোডিয়াস তাঁর ফাঁসির আদেশ দেন। মৃত্যুর আদেশ শুনে ভ্যালেনটাইন কারাপ্রধানের মেয়েকে নিজের ভালোবাসার কথা জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে লেখা ছিল ফ্রম ইয়োর ভ্যালেনটাইন'। ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সেই সময়কার নিয়ম অনুসারে তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইতিহাস ভ্যালেনটাইনের নাম মনে রাখলেও কারাপ্রধান বা তাঁর মেয়ের নাম মনে রাখেনি। এই ঘটনাকে মনে করে দিনটি অনেক দেশেই ভালোবাসার দিন হিসেবে পালিত হয়। যা কিনা ইউরোপীয় ক্যালেন্ডারে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বলেই উল্লেখিত।

এই দিনটি গত একাদশ শতাব্দী থেকে প্রথমে ফ্রান্সে তারপর আজকের পোল্যান্ড ও নরওয়ে হয়ে জার্মানি থেকে ইউরোপের দেশগুলিতে দম্পতিদের ভেতর উপহার দিবস হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আমেরিকানদের বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার দিন হিসেবে পালন করা হতো। কারণ হিসেবে বলা হতো ইউরোপ বা ইউরোপিয়ান ঘরানার দেশ আমেরিকার বেশিরভাগ বয়স্ক দম্পতির সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে ছিন্ন হয়ে পড়ত। সম্পর্কের টান না থাকায় কথায় কথায় স্ত্রীকে হেনস্থা করা প্রহার বা ঘরছাড়া হতে বাধ্য করা নিয়মিত ঘটনা ছিল। সেই সময়কার আইন অনুসারে বিবাহিত মহিলার সম্পত্তি স্বামীর দখলে চলে আসত। এই সম্পত্তি নিয়েই মূলত বিরোধের সূত্রপাত ছিল। পরে চার্চের প্রভাবে এই দিনটি দম্পতির মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে উপহার দিবস হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতে এইসবের কোনও প্রভাব ছিল না। ভারতের সামাজিক বন্ধন প্রথম থেকেই শক্ত। কিন্তু বিগত দেড় শতকে ভ্যালেনটাইন্স ডে'র প্রভাব ভারতে করোনার থেকেও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। প্রভাব বলতে কুপ্রভাবই বেশি পড়েছে। অশালীনতাই একমাত্র যার উপকরণ। এই প্রজন্মের কাছে প্রেমদিবসের ভাইরাস ছড়ালেও আমেরিকার পালিত হওয়া প্যারেন্টস ডে কবে জানেও না তারা।

নীতি পুলিশরা বলে কে কার সঙ্গে প্রেমে মাতবে, কটা প্রেম করবে, ক'জনের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করবে, কাকে বিয়ে করবে, তাতে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভালোবাসা কি এতটাই খেলো যে তাকে জনসমক্ষে এনে শরীরসর্বস্ব করতেই হবে? যে কোনও জায়গার শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণ করতে চাই বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা কিন্তু অপসংস্কৃতি নিতে অন্তত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাই এখন প্রেম দিবসের প্রস্তুতি অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। কিনতে হয় দামি গিফট্ (উপহার তো বাংলা শব্দ), গোলাপ, কার্ড, নতুন পোশাক। এই দিনটিকে মাথায় রেখে এখন গয়নার দোকানগুলিও বিশেষ ধরনের লকেট, আংটি প্রভতি তৈরি করছে। এই প্রজন্মের অনেকের কাছেই পারিবারিক সম্মান, ভারতীয় পরম্পরা, রুচিবোধ, সম্ভ্রম এমনকী কৌমার্য বিসর্জনের থেকেও 'মস্তি' বা 'এনজয়' (বাংলা কী জানা নেই) অনেক বড়ো।

প্রেম দিবসের প্রাসঙ্গিক আরও একটি বিষয় নীতি পুলিশরা বলেন, এখন তো ঘটা করে প্রেম শুরু হয়। তার জন্য পার্টিও হয়। আবার ব্রেক আপ তো লেগেই আছে তখন তারও আবার পার্টি হয়। হাওয়ায় ভাসা নোংরা ধুলোর মতো কত প্রেম ভাঙছে গড়ছে। কত সম্ভ্রম হারাচ্ছে। কত কৌমার্য স্বেচ্ছায় বিসর্জিত হচ্ছে কে হিসেব রাখে। মস্তিটাই তো আসল। কিন্তু যারা পরপর 'ব্রেক আপের' শেষে মা বাবার মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর সামনে সোনা মুখ করে বসে তখন মনে কোনও কালিমা আসে না তো? বিয়ের আগে অনেক পাত্রীর মা বাবা বড়ো মুখ করে বলেন তাঁদের মেয়ে কোনও দিনও কোনও ছেলের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। কথাটি যদিও হাস্যকর তবুও তখন মেয়েটির কি মনে হয় না সে তার মা-বাবা, নিজের ভাবী স্বামী এমনকী নিজেকেও ঠকাচ্ছে? ভ্যালেনটাইন্স দিনে এখানেই জয় নীতি পুলিশদের, যারা আজকের এই প্রজন্মের এই শ্রেণীকে দেখে আতঙ্কিত নিজের সন্তানের কথা ভেবে। তাঁরা চান একদিন নয় প্রতিদিন ভালোবাসার দিন থাকুক। প্রেম দিবসের সার্থকতা হোক ভারতীয় মাধুর্যে ভারতীয় জীবনবোধ নিয়ে। সামাজিক ও পারিবারিক মেল বন্ধনের সঙ্গে।

ফাল্গুনের প্রথম দিনটি হোক ভারতের প্রেমদিবস

কল্যাণ গৌতম

বিদেশি শাসন ও বিধর্মী-সংস্কৃতির বিপ্রতীপে সারাবিশ্বে ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রথম, তার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও তীব্র অশান্তি সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়, পরানুকরণের ঢল নামে এবং বিধর্মী রাজার ধর্মকে আপন ধর্ম করে তোলার সক্রিয় প্রয়াস চলে। তৃতীয়, বিধর্মী-সংস্কৃতিকে অতিক্রম করতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখানোর নীরব ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলে।

খ্রিস্টান-ইংরেজ আমলে ভারতীয় মুসলমানরা সামরিকভাবে পরাজয়ের পর সর্বতোভাবে বিরোধিতার পথে গিয়ে ক্রমে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং শিক্ষাদীক্ষায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ল। বিপ্রতীপে ভারতীয় হিন্দুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইংরেজদের সঙ্গে প্রাণঢালা মিতালি করলো, তাদের অনুকরণ করলো এবং ইউরোপীয় শিক্ষার সুযোগে এগিয়ে চললো, যার-ই ফলশ্রুতিতে দেখা গেল হিন্দু নবজাগরণ। তৃতীয় যে জাতীয়তাবাদী ধর্মীয়-ধারা, যার নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁরা খ্রিস্টান-সম্পৃক্ত ধর্মীয় ও সংস্কৃতির দিনগুলিকে বেছে বেছে হিন্দুত্বের পরত মাখিয়ে দিলেন, হিন্দুত্বের নতুনভাবে জয় সাধিত হলো।

১ জানুয়ারি যত না খ্রিস্টীয় উৎসব, তার চাইতেও কল্পতরুর সুগন্ধি আরও প্রকট হচ্ছে। ১৮৮৬ সালের এই দিনটিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। নিঃশব্দে একটি ধর্মীয় বিপ্লব এনে দিলেন তিনি খ্রিস্টীয় দুনিয়ায়। এর যে কতটা শক্তি, তা আগামী দিনে খ্রিস্ট-সমাজ বুঝতে পারবে, ততদিনে ধর্মনদী ধর্মতলা পেরিয়ে অনেক দূরে বয়ে যাবে। একইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রম করে কন্যাকুমারীর শেষ শিলায় ধ্যানে বসে (১৮৯২) অখণ্ড ভারত দিবস করে তুললেন, যখন সমগ্র ব্রিটিশ-ভারত যিশুর ভজনায় উৎসবমুখর। ভাবা যায়!

স্বামী বিবেকানন্দ এই কাজটি হয়তো খুবই চিন্তাভাবনা নিয়েই করেছেন। এর আগেও তার সূচনা দিয়ে গেছেন, এই দিনটিকে তিনি নতুনভাবে গড়ে তুলবেন। ১৮৮৬ সালেরই ২৪ ডিসেম্বর রাতে ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাস নেবার শপথ নিলেন হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে স্বামী প্রেমানন্দের বাড়িতে। কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে করে একটি খ্রিস্ট-ধর্মীয় দিবসকে এককথায় অতিক্রম করে চলে গেলেন তিনি। অন্য দিনও তো ছিল! কই বাছলেন না তো সেই সব দিন! আঁটপুরেও তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন তার আগেই। যতদিন যাবে বিশ্ববাসী দেখতে পাবেন কন্যাকুমারীর পাষাণ শিলায় স্বামীজী জীবন্ত হয়ে সীমানা ছাড়িয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। এবং ঘটনাচক্রে ওই দিনটি হবে ২৫ ডিসেম্বরের বড়োদিন। কী ব্যতিক্রমী প্রতিস্পর্ধা! বিবেকানন্দ কেন্দ্র ওই দিনটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পাষাণের মধ্যেই স্বামীজীকে বোধন করে খ্রিস্টধর্মকে অতিক্রম করে গেল এক নীরব বিপ্লবের মধ্যে; এবার তারই সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। একেই

বলে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। বড়োদিন আর ইংরেজি বছরের প্রথমদিনটি যথাক্রমে স্বামীজী ও পরমহংসময় হয়েই থাকবে!

সেভাবেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের দিনটিকেও অতিক্রম করে সনাতনী পরত মাখিয়ে দিতে হবে। কে আছেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী কার্যকর্তা? যে ভালোবাসা চিরন্তন, যে ভালোবাসা হতে পারে নিখাদ, যে ভালোবাসা হতে পারে একেবারেই নিঃস্বার্থ— তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি জুড়ে বসুক ভারতবর্ষে, পিতৃ-মাতৃ পূজন দিবস হিসেবে। আর দেহবাদের ভালোবাসার দিনটি হোক ১ ফাল্গুন, ভারতীয় মতে। ১৪ ফেব্রুয়ারিকে আমরা অস্বীকার না করেই দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি পিতা-মাতার স্নেহাশীর্বাদের অকৃত্রিমতা। ভালোবাসার জয় এভাবেই হোক ভারতীয় রীতিতে। পিতা-মাতাকে ভালোবাসার দিন, পুত্র-কন্যা, পৌত্র- পৌত্রীকে ভালোবাসার দিন হোক ১৪ ফেব্রুয়ারি। ঔপনিবেশিকতার পরাজয় এভাবেই ঘটুক। তার পরই ১ ফাল্গুন অশোক ফুলের মঞ্জরী দিয়ে পালিত হোক ভারতীয় প্রেমের দিবস, বসন্তোৎসব।

গোলাপ দিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, অশোক-পরশে ১ ফাল্গুন হবে ভারতীয় মতে প্রেমের দিন। ভারতবর্ষ প্রেমের উৎসব আদি-অনন্তকাল ধরে করে এসেছে— ফাল্গুনের অশোক রঙের নেশায়। ভ্যালেনটাইন'স ডে আমাদের কাছে দেশীয়-সংস্কৃতি ভোলানো পাশ্চাত্য মদিরা মাত্র। আমাদের চির যৌবন চাঞ্চল্য নিয়ে আসে অশোকে রাঙিয়ে-

গোলাপ দিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, অশোক-পরশে ১ ফাল্গুন হবে ভারতীয় মতে প্রেমের দিন। ভারতবর্ষ প্রেমের উৎসব আদি-অনন্তকাল ধরে করে এসেছে— ফাল্গুনের অশোক রঙের নেশায়। ভ্যালেনটাইন'স ডে আমাদের কাছে দেশীয়-সংস্কৃতি ভোলানো পাশ্চাত্য মদিরা মাত্র। আমাদের চির যৌবন চাঞ্চল্য নিয়ে আসে অশোকে রাঙিয়ে— আমরা তাই অদ্ভুত আনন্দে বেড়া ভাঙি, ঝঞ্ঝায় বাঁধন ছিন্ন করে দিই, জীবনযুদ্ধে মরণপণ লড়তে প্রেরণা পাই। আমাদের সেই দিনগুলি ফিরিয়ে দিক অশোক মঞ্জরীর পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে আসা প্রেমিক-প্রেমিকারা। রোজ-ডে-র পেলবতা, অপর-সংস্কৃতি নয়। চাই অশোক-পরশ।

'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই— আমরা বিদ্যুৎ।।
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।।'

অশোকপরশ কেন, রোজ-ডে কেন নয়!

'সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা' (মালঞ্চ উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অশোক ফুল হচ্ছে প্রেমের প্রতীক, তাই কামদেবের পঞ্চশরের অন্যতম শর অশোক মঞ্জরী, যে বাণে বিদ্ধ করা যায় নারী অথবা পুরুষের প্রেম-মনন। অশোক ফুলের অনবদ্য রং কখন নিজের মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়,

'তোমার অশোক কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগল আমার
অকারণের সুখে।'

ফাগুনের বসন্তে অশোকের ফুল ফোটে, তাই ১ ফাল্গুন হোক ভারতীয় প্রেমের দিন, অশোকপরশ, অশোক ডে। অশোক ফুলের আদিনিবাস ভারতবর্ষ। এটি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। ভারতের কুসুমোদ্যানে তার অমল উপস্থিতি।

অশোক গাছের উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম— Saraca asoca, এটি Fabaceae গোত্রের

উদ্ভিদ। এরই অন্য নাম হেমাপুষ্প কিংবা মধুপুষ্প। রামায়ণে উল্লেখ্য আছে, রাবণ সীতাকে বিবাহ করবার উদ্দেশ্যে হরণ করে অশোক কাননে রেখেছিল, যাতে সীতার হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক ঘটে। হিন্দু বিশ্বাস, অশোক ফুল শোক নাশ করে, তাই এর নাম অশোক। অশোক গুচ্ছ উপহার দিয়েই তাই প্রেমের জোয়ারে ভাসুন, প্রেমের আনন্দের সঙ্গে দূরে যাক যাবতীয় দুঃখ-শোক। প্রেম জয়ী হোক, সফল হোক, চিরস্থায়ী হোক। আর প্রেমসম্ভোগের কারণে আবির্ভূত সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। তাই তো চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে মায়েরা সন্তানের কল্যাণ কামনা করে অশোক ফুল দিয়ে পূজা করেন, একে অশোকষষ্ঠী বলে। চৈত্রের শুক্লাঅষ্টমীতে পালিত হয় অশোকাষ্টমী। দুটি দিনই বসন্তের ঋতুতে। □

বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়?

নিখিল চিত্রকর

গলির মুখে প্রসস্ত রাস্তার পাশে সেজে উঠছে আর্চিস গ্যালারি, রংবেরঙের ঢাউস গ্রিটিংস কার্ডের সারি। যত্রতত্র লতিয়ে ওঠা কেক বিপণির মাথায় টিমটিমে নিয়নের ডিসপ্লেতে তথাকথিত ভালোবাসা দিবসের

বিশেষ ছাড়! কোনো জুয়েলারি দোকানের শোকেসে ঝুলে রয়েছে একফালি সোনার 'হার্ট'। এসব ছাড়িয়ে আরেকটু ভিতরে সেঁধিয়ে গেলেই 'ওয়ো', 'মেক মাই ট্রিপ', 'বুকিং ডট কম'-এর ডিসকাউন্ট। লাল, হলুদ, গোলাপ। তুলতুলে পিংক টেডি আর সিল্ক চকোলেট। এই হলো হালফিলের প্রেমদিবস। ভ্যালেন্টাইন ডে। গড়পড়তা ওয়েস্টার্ন ভালোবাসা দিবস। এতেই মজে আছে বং জেনারেশন। দেশীয় অতীত গরিমার আত্মবিস্মৃতি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ। পাশ্চাত্যের ঠুলি পরানো প্রেমের আড়ম্বর আমাদের নয়। আগাপাশতলা কৃত্রিম মোড়কে জড়ানো এই কর্পোরেট ভালোবাসার প্রদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

ভ্যালেন্টাইন ডে শব্দটা প্রথম শুনি ২০০০ সালে। তখন আমাদের নীল-সাদা ইউনিফর্মে পড়ুয়া জীবনযাপন। আজকের মতো হুট বলতেই মুঠোফোনে নেট সার্ফিঙের ঢল তখনও নামেনি। সিনিয়র দাদা-দিদিদের মুখে ভাসা ভাসা যেটুকু শোনা আর কী! তবে সেসব ছাপিয়ে আমাদের মন তখন বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের নৈসর্গিক প্রেমে তন্ময় হয়ে ছিল। আমাদের চোখের সামনে তখন চণ্ডীদাস। পূর্বরাগের কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে আমাদের বাংলার শিক্ষক ফটিক পুরকাইত তখন নাটকের ভঙ্গিমায় রাধার বিরহের বর্ণনা দিচ্ছেন। ময়ুর-ময়ূরীর কণ্ঠের কালো রং অথবা মেঘের কালিমা দেখে, দু'হাত তুলে কৃষ্ণসঙ্গ চাইছেন রাধা! ক্লাসের অতি বিচ্ছু ছেলেটাও হাঁ হয়ে শুনছে। মনে তখন আশা ভোঁসলের 'বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়...। পরে বুঝেছি এই অপার্থিব প্রেমের অনুভূতি চিরদিনের। এর জন্য আড়ম্বর বা বিশেষ দিনের প্রয়োজন হয় না।

আজকাল ভ্যালেন্টাইন নামে ভালোবাসার দিন নিয়ে দেদার মাতামাতি চলছে শহর থেকে গ্রামে। এভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণের স্পৃহা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে। বর্তমান প্রজন্ম প্রকাশ্যে সম্পর্কের স্ট্যাটাস দিতে পিছপা হয় না। যুগলে মিলে নিজস্বী তোলে। অথচ তাদের নিজস্ব ঘরানার দোরে অপসংস্কারের খিল আঁটা।

বেলুড় মঠের প্রশান্ত মহারাজ একটা গল্প বলেছিলেন। এক দৃষ্টিহীন কামাখ্যাপীঠ দর্শনে গেছেন। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে সবাই প্রসন্ন বদনে মা-কে প্রণাম করছেন। প্রার্থনা করছেন। দৃষ্টিহীন তীর্থযাত্রী এক কোণে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্মিত হাসছেন। পাশের লোকটি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, মহাশয় আমরা তো মা-কে দেখে দুচোখ সার্থক করলাম। কিন্তু মায়ের দর্শনের জন্য আপনার সেই দৃষ্টিশক্তিই নেই। তাও আপনি এত প্রসন্ন কেন? অন্ধ তীর্থযাত্রীটি একগাল হেসে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাতে কী? মা-তো আমায় দেখছেন!' পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে আজকের প্রজন্ম ভুলে গেছে এদেশের সভ্যতায় প্রেমের স্থান স্বতন্ত্র ও সর্বোপরি। তা শুধু কূপমণ্ডুকতায় সীমিত নয়। তার পরিসর অনন্ত। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এদেশের যুবসমাজ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করে ওদের যা কিছু ভালো, যা কিছু গঠনমূলক সেগুলোই আয়ত্ত করুক। আজকের যুবসমাজ চলমান ভিড়ের অনুসারী হয়েই কি থাকতে চায়?

দেখা হলেই করমর্দন, কোলাকুলি, চুম্বন পাশ্চাত্যের এসব রীতি কোভিড পরিস্থিতিতে অস্পৃশ্য হয়ে গেল। বিশ্বজুড়ে থেকে গেল শুধু ভারতের প্রবর্তিত 'নমস্কার'। বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের দূর থেকে করজোড়ে নমস্কারের ভঙ্গি ভাইরাল হয়েছে। এমন বহু সহবত- সংস্কারেই ভারত বিশ্বগুরু হয়ে উঠতে পারে। সেখানে যুব সমাজকে 'ট্রেন্ড সেনটারের' ভূমিকা নিতে হবে। সেই ট্রেন্ড সেটারের আজ বড়ো অভাব। ভ্যালেন্টাইনের প্রমোদ পার্টিতে প্রেমের প্রস্তাবে 'উইল ইউ বি মাই ভ্যালেন্টাইনের' বুলি না আওড়ে রবি ঠাকুরের 'অনন্ত প্রেম'-এর কাহন ক'জন শোনায়? কারাই-বা বলে, 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" ▫

বিশ্বের সব শিবভক্ত শিবগোত্রের অন্তর্ভুক্ত

মহন্ত যোগী সুন্দর নাথ মহারাজ

সনাতনী হিন্দুরা আজন্মকাল যে দশবিধ সংস্কার গর্ভাধান-পুংসবন-যজ্ঞোপবীত ধারণ-বিবাহ থেকে মৃত্যু পরবর্তী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত পালন করেন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে গোত্র ও প্রবর সম্পর্কে সাধারণ বা ন্যূনতম জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ সকল পূজা-পার্বণে সংকল্প করার সময়ে পুরোহিত ও যজমান উভয়ের গোত্রের উল্লেখ প্রয়োজন। তাই গোত্র কী তা জানা খুবই প্রয়োজন।

গোত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সুচনালগ্ন থেকে এর ইতিহাস জানা প্রয়োজন। নাথ দর্শনে বিশ্বাস করা হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের পরমপুরুষ নিঃশেষ্ট, যিনি কিছুই করেন না, অকর্তা অর্থাৎ নির্বিকার, জন্ম-মৃত্যু, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, সৃষ্টি-ধ্বংস এই সব রকম পরিণাম বা নিয়মের মধ্যে যিনি পড়েন না। উল্লেখযোগ্য, গীতা-২/২০ শ্লোক— 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে (হন্য, মানে শরীরে।) এবং নিরাকার অর্থাৎ যার কোনো অবয়ব নেই, তাকে দেখা যায় না, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্তরে বোধিতে বোধ হন। তাই তাঁকে 'অলখ্ নিরঞ্জন' নামে অভিহিত করা হয়। সেই নিরঞ্জন পুরুষের ইক্ষণ (আদেশ বা ইচ্ছা) অনুযায়ী তারই সত্যমায়ারূপী, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে জাত ও নির্দেশিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য শুরু করলেন। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারজন মহর্ষিকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন সৃষ্টি বিস্তারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মোক্ষলাভেচ্ছু, ব্রহ্মচারী ও ব্রতচারণকারী এই সনকাদি কুমারেরা বংশবিস্তার কার্যে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এই সমস্যার সমাধানে, পরমেশ্বর ভগবান নিরঞ্জনের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা স্বয়ং প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য

দশটি পুত্র উৎপাদন করলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ ও দশম পুত্র নারদ। ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও দিব্য ভাবনা থেকে নারদের জন্ম হয়। বশিষ্ঠের জন্ম হয় তাঁর নিঃশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে, পুলস্ত্য কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হন।

এ প্রসঙ্গে ঋষি বৌধায়নের সূত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে ঋষি বৌধায়ন খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতকের এমন একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গণিতবিদ ছিলেন, যাকে আজ থেকে কিছু বছর আগেও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছিল। তিনি বৌধায়ন সূত্র নামক গ্রন্থের লেখক। তাঁর বিখ্যাত কিছু গাণিতিক কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রায় নির্ভুল ভাবে 'পাই'-এর মান নির্ণয় এবং আর একটি কাজ করেন যেখানে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের একটি আলাদা সমাধান দেখানো হয়। তার ফলে প্রমাণিত হয় পিথাগোরাসের অনেক আগে থেকেই উপপাদ্যের গাণিতিক সমাধান ও চর্চা ভারতে করা হতো।

ঋকসংহিতায় যাঁরা ঋষি পদবাচ্য, বৌধায়নের শ্রোতগ্রন্থে তাদের নামেই গোত্র নিরূপিত হয়েছে। বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, সত্যাষাঢ়, ভরদ্বাজ, লৌগাক্ষি প্রভৃতি রচিত শ্রৌতসূত্রে বিভিন্ন গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌধায়নসূত্রে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সাতজন ঋষিই আদি গোত্রকার বলে নির্দিষ্ট আছেন। তাদের অপত্যদের মধ্যে যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হতে পেরেছিলেন তাঁদের নামেও গোত্র প্রবর্তিত হয়। আর সেই সেই গোত্রের প্রবর্তনকারীদের সেই সেই গোত্রের প্রবর বলে। মৎস্যপুরাণে ১৪৫/৯৮-১১৭ শ্লোকে ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া, মৎস্যপুরাণের ১৯৫-২০২ অধ্যায় পর্যন্ত ঋষিগণের গোত্র, প্রবর ও বংশপরম্পরা বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

মনুরুবাচ—

ঋষিনাং নাম-গোত্রানি-বংশাবতরণং তথা। প্রবরাণাং তথা সাম্যসাম্যং বিস্তরাদ্বদ।। (ম. পু. ১৯৫/২)

মনু মৎস্যরূপী ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভগবান। ঋষিগণের নাম, গোত্র, বংশ-বিবরণ ও প্রবরসমূহের সাম্য-অসাম্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করি।

মনুর সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মৎস্যরূপে পরপর কয়েকটি অধ্যায়ে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, পরাশর ও অগস্ত্যের গোত্র ও বংশের বর্ণনা করেন। মৎস্যপুরাণের সেই বর্ণনা থেকে কীভাবে ব্রহ্মার সৃষ্ট ঋষিগণ থেকে পরবর্তীকালে গোত্রের মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই শাখা বহু বিস্তার লাভ করে। সপ্তর্ষি থেকে সৃষ্ট গোত্রের ধারা, পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু ধারায় বিভক্ত হয়।

সপ্তর্ষি থেকে গোত্র প্রবর্তিত হলেও, পরবর্তীকালে গোত্র ও প্রবরের মাধ্যমে বহু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মাধ্যমে বহু গোত্র প্রবর্তিত হয়। গোত্রের সংখ্যা নিরূপণ করতে গিয়ে বৌধায়ন নিজেই বলেছেন—

গোত্রানাং তু সহস্রাণি
প্রযুতান্যর্ব্বুদানিচ।
ঊনপঞ্চশদষৌং প্রবরাঋষিদর্শনাৎ।।

এই শ্লোক অনুসারে, সহস্র গোত্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে সহস্রশীর্ষা পুরুষের মতো সহস্র বলতে অসংখ্য বোঝানো হয়েছে। তাই প্রধান কয়েকটি গোত্র চিহ্নিত করা গেলেও গোত্র সর্বমোট কয়টি তা নিরূপণ করা যায় না। কারণ, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ থেকেই গোত্র প্রবর্তিত হয়েছে। গোত্রপ্রবর্তক সেই সকল ঋষির আমরা সবাই বংশজ। তবে পরবর্তীতে কেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারটি বর্ণতে বিভাজিত হলো? সেক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মসূত্রে সকলেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণ বিন্যাস জন্মসূত্রে নয়, বরং গুণ অনুসারে নির্ণীত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) বলেন—

চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং
বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।

'প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানবসমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এর প্রথম স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।'

শ্লোক অনুসারে বর্ণবিভাগ যে জন্মানুসারে নয়, বরং কর্মানুসারে তা শতভাগ নিশ্চিত। তাই একই গোত্রে কর্ম ও গুণানুসারে চারটি বর্ণ থাকতে দেখা যায়। কেউ যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন তথা বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজে পারদর্শী হন এবং সেভাবে জীবিকা অবলম্বন করে তবে সে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধাদিকার্যে পরিচালনায় দক্ষ হলে ক্ষত্রিয়, ব্যবসা বাণিজ্যে জীবিকা নির্বাহ করলে বৈশ্য এবং সেবাদানকারীর বৃত্তি গ্রহণ করলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। কিন্তু এই সকল গোত্রের মধ্যে শিব গোত্রের উল্লেখ নেই কেন? কারণ শিব স্বয়ং নিরঞ্জন স্বরূপ। গোত্র হতে গেলে তার একটি ঊর্ধ্বতন সৃষ্টিকর্তা থাকার প্রয়োজন। কিন্তু যিনি স্বয়ং স্বয়ম্ভু, জন্ম-মৃত্যু রহিত তার আবার কেমন করে গোত্র হবে?

দেবী হৈমবতীর সঙ্গে যখন শিবের বিবাহ স্থির হলো, তখন গিরিরাজ হিমালয় ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর হবু জামাতার কুল-বংশ পরিচয় কী? তিনি তাঁর মেয়েকে কোন গোত্রে গোত্রান্তরিত করতে যাচ্ছেন? শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন, যিনি অনাদিরও আদি, সবথেকে পুরাতন হলেও চিরনবীন, সকল দেবতা এমনকী তিনি আমারও উপাস্য দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর থেকেই এই সৃষ্টি প্রবাহিত হয় এবং প্রলয়ে সবকিছু তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়, তাই তিনি গোত্র রহিত। কিন্তু সকল গোত্রেরই আদিপ্রবর (প্রবর্তক) তিনিই। 'সর্বগোত্রম্ পরিত্যাজ্যম্ শিবগোত্রম্ পরিকীর্ততে'। তাই শিব গোত্রের পরিবর্তে অনেক শৈব নিজেদের 'অনাদি গোত্র', 'নিরঞ্জন গোত্র' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেন।

সেই অলখ নিরঞ্জনের ঈক্ষণে বা আদেশ অনুসারে তারই মূলভূতসত্তা, আদিনাথ শিবশম্ভু সৃষ্টির নিমিত্তে

বংশবিস্তার করলেন। আর তার তেজ-জাত যে রুদ্রকুল তৈরি হলো, তারাই রুদ্রজাত বলে 'রুদ্রজ', পরম যোগী মহাদেব কুলজাত বলে 'যোগী' এবং আদিনাথ বংশজ বলে 'নাথ' নামে সুপরিচিত হলেন। কন্যা যেমন পিতার গোত্র থেকে স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হয়, তেমনি কেউ যখন শিব ভক্ত হন, তখন তিনি শৈব বা শিব গোত্রভুক্ত হন। তাই এই বিশ্বের সকল শিবভক্ত শৈবই, শিবগোত্রের। 'নাথ নাথ ভজে না কোই, যো নাথ কো ভজে, বো খুদ নাথ হোই।'

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচনা না করলেই নয়। শিব গোত্রীয়দের মধ্যে কি সমগোত্রে বিবাহ হয়? এই প্রসঙ্গে অন্যান্য গোত্রের মানুষজন বড়োই সমালোচনা করেন শিবগোত্রীয়দের। কারণ প্রায়ই শোনা যায়, একই গোত্রে বা একই বংশে বিবাহ করা অশাস্ত্রীয়। এক্ষেত্রে শাস্ত্রে কী বলা হয়েছে? মনুসংহিতায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে।।

অর্থাৎ যে বিবাহযোগা কন্যা, মাতার সপিণ্ডা না হয়, অর্থাৎ পাত্র বা ছেলে, সেই কন্যার সপ্তপুরুষ পর্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত না হয় ও মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত সগোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয়, অর্থাৎ পিতৃস্বসাদির সন্তান সম্ভব সম্বন্ধ না হয়, এমন কন্যাই দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) বিবাহের যোগ্য বলে জানবে (মনুসংহিতা ৩/৫-৬)।

বৈদিক শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বিজ্ঞানসম্মত নয়। এধরনের সম্পর্কের ফলে যে সন্তান হয়, তার মধ্যে জন্মগত ত্রুটি দেখা দেওয়ার ঝুঁকি প্রবল। 'দ্য ল্যানসেট' সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা এ তথ্য জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডফোর্ড শহরে বসবাসকারী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক গবেষণা চালিয়ে দেখা যায়, নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের

মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের জিনগত অস্বাভাবিকতার হার সাধারণ শিশুদের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। এসব অস্বাভাবিকতার মধ্যে নবজাতকের অতিরিক্ত আঙুল গজানোর মতো সমস্যা থেকে শুরু করে হৃৎপিণ্ডে ছিদ্র বা মস্তিষ্কের গঠনপ্রক্রিয়ার ত্রুটি দেখা দিতে পারে। গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ফিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এয়ারমন শেরিডান। ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী সাড়ে ১৩ হাজার শিশুকে ওই গবেষণার আওতায় আনা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের প্রচলন রয়েছে। সারাবিশ্বে ১০০ কোটির বেশি মানুষ এ রকম সংস্কৃতি ধারণ করে। কিন্তু শিবগোত্র তথাকথিত কোনো একজন ঋষির বংশধারা বহন করে না। যুগ যুগ ধরে যেসকল জনগোষ্ঠী শিবকে তাদের প্রধান উপাস্য বলে স্বীকার করেছেন, তারা সবাই শিবগোত্র প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে এই গোত্রে অসংখ্য পদবি সংবলিত নানান ধারার মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে, ফলে রক্ত সংক্রান্ত সমগোত্রীয় হওয়ার সম্ভাবনা তেমনভাবে তৈরি হয়নি।

এরপর আসি প্রবর নিয়ে। 'প্রবর' কথাটির অর্থ হলো— প্রকৃষ্ট রূপে বর বা শ্রেষ্ঠ বা বরণীয়। প্রবর = প্র—বৃ + অপ। অর্থাৎ প্রাবরণ/প্রকৃষ্টবর। কোনো আদি ঋষির নামে যে গোত্র, তার সঙ্গে সেই গোত্রের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ঋষির নাম উল্লেখ করার যে বিধি আছে তাদের প্রবর বলা হয়। সনাতন রীতিনীতিতে গোত্রের সঙ্গে প্রবর উল্লেখ করারও বিধি আছে। প্রবর হিসেবে ১/২/৩/৪ বা ৫ জন সেই বংশের অপত্য পত্যয়ান্ত ঋষির নাম, অনুলোমক্রমে (অনুলোম অর্থাৎ বড় থেকে > ছোটো/উপর থেকে নীচে/—> পিতামহ —> পিতা —> পুত্র) উল্লেখ করতে হয়। এই ঋষিদের নাম প্রতিলোম (ছোটো থেকে বড়ো) হিসেবে উল্লেখ করা, বিধি বহির্ভূত। গোত্র ও প্রবরের মাধ্যমেই বৈদিক যুগের ঋষিদের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুদের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। শিব গোত্রের প্রবর হলো, শিব, শম্ভু, সরোজ, ভূধর, আপ্লুবৎ। অনাদি গোত্রের প্রবর হলো, অনাদি, শিব, স্বয়ম্ভু, সরোজ, ভূধর। অর্থাৎ দুটি গোত্রই মূলগত এক। শিব গোত্রের পঞ্চপ্রবর, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতীক। যেমন,

শিব = আকাশ/ব্যোম/শব্দ/কর্ণ/বাক।

শম্ভু = অগ্নি/তেজ/রুপ/চক্ষু/পাণি (হাত)।

সরোজ = অপ/জল/রস/জিহ্বা/উপস্থ বা রেচন-জনন অঙ্গ।

ভূধর = পৃথিবী/ক্ষিতি বা মাটি/গন্ধ/নাসিকা/পায়ু।

আপ্লুবৎ = বায়ু/মরুৎ/স্পর্শ/ত্বক/পদ বা পা।

গুণী চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার গুণী চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন তাঁর ছবির মাধ্যমে রসিকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। মৃত্যু ২০০৮ সালে কলকাতায়। আমি যখন ১৯৮৩-৮৪ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগের প্রথম ব্যাচে ভর্তি হই, তার কিছু দিনের মধ্যে শানু লাহিড়ী পরিতোষবাবুকে জোড়াসাঁকোতে একটা আলোচনা সভায় ডেকে এনেছিলেন। ওই সভাস্থলে পরিতোষবাবুকে প্রথম দেখি। পাঞ্জাবি পরিহিত বড়ো জুলপির অধিকারী। তাঁর সুন্দর গোছানো কথাবার্তার পাশাপাশি গোল চশমার ভেতর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটির কথা বলতেই হয়। দ্বিতীয়বার ১৯৯১ সালে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ৯নং ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোডের তিন তলার ফ্লাটে ডিসেম্বরের শীতের দুপুরে গিয়েছিলাম। নিঝুম সম্ভ্রান্ত ওই অঞ্চলে সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় শকুনের পালক গোঁজা বড়ো দরজার সামনে গিয়ে বেল বাজালাম। ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে বসতে বললেন। তার কিছুক্ষণ পর পরিতোষবাবু এলেন। ড্রইং রুমের একপাশে দেখলাম বড়ো আকারের ভিনসেন্ট ভ্যান গগের উপর ভিত্তি করে আঁকা একটি অসমাপ্ত ক্যানভাস রাখা।

তিনি ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের উপর আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। ১৯৯১ সালে রবীন্দ্র ভারতীর দৃশ্যকলা বিভাগের একটি বিশেষ প্রবন্ধ জমা দেওয়ার ব্যাপার ছিল। আমি পরিতোষবাবুকে একটা প্রশ্ন করে ছিলাম— ফ্রান্সের শিল্পীরা এখন কী ধারায় ছবি আঁকছে? উনি বললেন, 'ওখানে বিভিন্ন দেশের চিত্রশিল্পীরা যে যার মতো নিজস্ব ভাবধারায় ছবি আঁকছে...। টেকনিকও নিজের মতো করে প্রয়োগ করছে।' একবার বেকবাগানের প্রাইভেট একটি গ্যালারিতে তিনি তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। সঙ্গে কলকাতার নানা বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরাও ছিলেন। তিনি সোফাতে বসে কথা বলছিলেন। সেই সময় গতিময় চিত্রকলার প্রবক্তা ইউরোপের জিওকোম বাল্লার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করি— 'গতিময় চিত্রকলা'র লিমিটেশান বা সীমাবদ্ধতার কথা বললেন। আরও বললেন, 'এই বিষয় নিয়ে আরও ভাবতে হবে।'

২০০১-এর পরবর্তী সময়ে খিদিরপুরের লালবাতি স্টপের সুউচ্চ ফ্লাটবাড়ির পাঁচ তলাতে উদ্বোধন পত্রিকায় লেখার জন্য যাই। সঙ্গে আমার দাদাও ছিলেন। ওই সময় দীর্ঘক্ষণ ছবি আঁকা নিয়ে নানা কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করলেন, বোম্বাইয়ের পার্শ্ববর্তী কোনো একটি অঞ্চলে একবার যাচ্ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন মঠে যান। সেখানে এক মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বইটা তাঁর হাতে দেন। ওই বইটা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ও খুব ভালো লেগেছিল। পরে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ঠাকুরের কথাভিত্তিক শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের লিখিত শ্রীশ্রীকথামৃতের উপর ভিত্তি করে কিছু ছবি আঁকেন। যেমন একটি ছবি ছিল, বাড়ির কাজের লোক যতই বাবা বাছা করুক না, কিন্তু মন পড়ে থাকে নিজের বাড়িতে। কাজের লোক মনে মনে বোঝে এই বাড়িতে যতই থাকি না কেন এটা আমার আসল বাড়ি নয়। ওই আলোচনাতে জানতে পারলাম তাঁর প্রিয় সিনেমার অভিনেতার মধ্যে মহানায়ক উত্তম কুমারও পড়েন না। তাঁর প্রিয় শিল্পীর মধ্যে ছিল ভারতীয় রাজস্থানি চিত্রকলা, যামিনী রায়ের পোস্ট-ইমপ্রেসেনিস্ট চিত্রশিল্পী হলান্ডের ভিনসেন্ট ভ্যাম গগ ও স্পেনের বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী পোবালো পিকাসো। যার সঙ্গে উনি ফ্রান্সে সাক্ষাৎ ও শিল্প আলোচনা করেছিলেন। এঁদের প্রভাব শিল্পী পরিতোষবাবুর উপর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমৃত্যু রয়ে গিয়েছিল। □

পশ্চিমি হাওয়ায় মেতেছে বাঙ্গালি

পশ্চিমি হাওয়া গ্রাস করছে সমগ্র পৃথিবীকে, ভারতবর্ষও তার বাইরে নয়। নিজের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে সেই বৃক্ষের ছায়া সংস্কৃতির বিশ্বদরবারে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভিনদেশি হাওয়ায় গা ভাসাচ্ছে বাঙ্গালি। কী বলছেন বিশিষ্টজনেরা, আসুন জেনে নিই। সাক্ষাৎকারে— অনামিকা দে।

সমাজে যাতে কোনো কুপ্রভাব না পড়ে

অলোকা কানুনগো
বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী

নতুন কোনো নিয়মরীতি গ্রহণ করার মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখিনা। তবে হ্যাঁ, কোনোকিছুই যেন মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না হয়। নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বজায় রেখে নতুনকে গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়! যেমন আমাদের জন্মদিন। আমাদের রীতি অনুযায়ী তো নক্ষত্র তিথি দেখে জন্মদিন পালন করা উচিত কিন্তু আমরা ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী সেটা পালন করে থাকি। সকল সংস্কৃতির বিশেষ দিনই আমরা পালন করতে পারি তাতে কোনো বাধা নেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এর ফলে সমাজে কোনো কুপ্রভাব যেন না পড়ে। আমরা যেমন ক্রিসমাস পালন করব তেমনি ভ্যালেন্টাইন্স ডেও পালন করব। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ইয়াং ছেলে-মেয়েরা খোলাখুলি প্রেম বিনিময় করে, সেটি কাম্য নয়। যদিও আমি মনে করি এগুলো খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কে কীভাবে এই দিনগুলি কাটাবে সেটা তার নিজের ব্যাপার। তবে মাথায় রাখতে হবে আমাদের ঐতিহ্য যাতে এর প্রভাবে নষ্ট না হয়। মানুষ তো পরিবর্তনশীল, পুরনো প্রথা ভেঙে নতুন প্রথা আসবেই। যেমন আগে পুরুষরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরত আর এখন প্যান্ট-শার্ট পরে। যুগের উপযুক্ত পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য। যেমন আমরা বাঙ্গালি হয়েও শিশুদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াই, যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে চাই বলেই।

নিজেদের সুস্থ, রুচিশীল, ভাবনাচিন্তাগুলো ভুলতে বসেছে বাঙ্গালি

প্রবুদ্ধ রাহা : বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী

পশ্চিমি সভ্যতা, সংস্কৃতি সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করছে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে ভারতবর্ষ যদি খুব এনলাইটেড বা শিক্ষিত দেশ হতো তাহলে ভিন্ন সংস্কৃতির গ্রাস করার আগে নিজেদের শিকড়টাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচানোর চেষ্টা করত। যেখানে আমাদের উচিত নিজেদের যে ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি তার বিস্তার ঘটানো সারা বিশ্বে, সেখানে আমরা ব্যর্থ। উলটে বিশ্বায়নের পথে হেঁটে সারা বিশ্বের সংস্কৃতি এসে মিশছে আমাদের সংস্কৃতিতে, এটা খুবই দুর্ভগ্যজনক। আসলে খেয়াল করলে দেখা যাবে যদি আমেরিকায় নতুন কিছু হয় তা দু'এক মাসের মধ্যে বম্বে, ব্যাঙ্গালোরে চলে আসে আর তিন মাসের পর কলকাতায় চলে আসে।

তবে গ্লোবালাইজেশনের অনেক ভালো দিকও আছে। কম্পিউটার যখন প্রথম এল তখন বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেয়নি, গেল গেল রব তুলে প্রযুক্তি শিক্ষায় পিছিয়ে দিয়েছিল এই রাজ্যকে। এখন যার ফলে অন্যান্য রাজ্য অনেক বেশি এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তাই গ্লোবালাইজেশনের শুধু খারাপ দিক আছে এটা আমি মানতে পারি না। আসল কথা, সঠিক শিক্ষার প্রসার নেই আমাদের মধ্যে। আমি এমন অনেক শিক্ষিত ডিগ্রিধারী লোককে দেখেছি যার আচরণে লজ্জায় মাথা হেট করতে হয়। বিদেশি আদবকায়দায় তো আমরা আমাদের মজ্জায় নিয়ে ফেলেছি, নিজেদের সুস্থ, রুচিশীল, ভাবনাচিন্তাগুলো ভুলতে বসেছে বাঙ্গালি। তারই প্রতিফলন বিভিন্ন 'ডে' পালন। বিশেষ করে ১৪-র ভ্যালেন্টাইনস্ ডে। অত্যন্ত স্থূল দেখানো একটি প্রথা যা আমাদের সংস্কৃতিতে বড়োই বেমানান। আজকাল তো অনেক প্রথাই পালটে যাচ্ছে। আগে বিয়ের দিনের পরের দিন একটি খুব সুন্দর রীতি ছিল 'বাসি বিয়ে'। কিন্তু এখন সেটা পালটে হয়েছে 'সংগীত', অবশ্যই হিন্দি উচ্চারণে। ঠিক বুঝতে পারি না বাঙ্গালি নিজের পারম্পরিক রীতির বদলে অন্যের অনুকরণে কেন মেতেছে।

এমন কিছু প্রকাশ্যে করা উচিত নয় যাতে গুরুজনদের সম্মান হানি হয়

ঋতুপর্ণা রায় : (রাজ্য মহিলা ক্রিকেট দলের হেড কোচ)

আমরা সবসময় ওয়েস্টার্ন কালচারকে রপ্ত করতে ভালোবাসি। যেমন 'ভ্যালেন্টাইনস্ ডে' পালন করছে বাঙ্গালি। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি পছন্দ, যে যেভাবে এটি নেবে। যে কোনো ভালোবাসার সম্পর্কই এটি পালন করতে পারে। ব্যাবসায়ীরা এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে ব্যবসায় কিছুটা লাভ করে নেয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একদম সঠিক। আর ইয়াং জেনারেশন, তারা তাদের মতো করে দিনটি পালন করে। আমি এরমধ্যে ভুল কিছু দেখি না। সময়ের সঙ্গে অনেক পরিবর্তনই আমরা গ্রহণ করি। তবে হ্যাঁ, 'ভালোবাসা' তো দেখানো অনুভূতির ওপর নির্ভর করে না, তাই অবশ্যই ইয়াং জেনারেশনের সেটা মাথায় রেখে এমন কিছু প্রকাশ্যে করা উচিত নয় যাতে গুরুজনদের সম্মান হানি হয়। এই শিক্ষাটা অবশ্যই আমাদের স্কুল, কলেজ ও বাড়ির শিক্ষার মধ্যেই থাকতে হবে।

স্বাধীন ভারতে মহাকাশ গবেষণা : এক আলোকদিশা

প্রিয়ঙ্কা ঘোষ

সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মহাকাশ নিয়ে মানুষের অপার কৌতূহল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হয়েছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি ততই বেড়েছে। একসময় মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশেও পাড়ি জমিয়েছে। ভারতবর্ষের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস বহু প্রাচীন। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মতো মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষ সুদূর অতীতকাল থেকে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রমুখ মহর্ষি প্রাচীনকাল থেকে প্রযুক্তির অভাব সত্ত্বেও নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। আর্যভট্টই প্রথম জানিয়েছিলেন সূর্যই পৃথিবীর কেন্দ্র। তিনিই প্রথম শূন্য ও দশমিকের ধারণা প্রচলন করেন। 'আর্যভট্টীয়', 'আর্যসিদ্ধান্ত', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', বরাহমিহিরের 'সূর্যসিদ্ধান্তিকা', 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' প্রভৃতি গ্রন্থাবলি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্পদস্বরূপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। তার প্রভাব শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে গভীরভাবে পড়েছে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। দীর্ঘ শোষণের ফলস্বরূপ অর্থনৈতিকভাবে দীর্ণ ভারত একদিকে সামাজিকভাবে ধর্মীয় ভেদাভেদে বিধ্বস্ত, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশের নিরন্তর বৈরিতায় বিপর্যস্ত।

ঠিক এইরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মহাকাশ গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশে আধুনিক মহাকাশ গবেষণা প্রচলনে এগিয়ে আসেন ড. বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে, দেশ যখন সামাজিক ভেদাভেদ ও প্রতিবেশী দেশের প্রতিকূলতায় বিধ্বস্ত, তখন মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনেকের কাছেই নিতান্তই বাতুলতা মনে হলেও, ভারতীয় আধুনিক মহাকাশ গবেষণার প্রাণপুরুষ ড. বিক্রম সারাভাই সকলকে বুঝিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের কৃষি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষাক্ষেত্র, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান সবকিছুর উন্নতির একমাত্র পথ মহাকাশ গবেষণার প্রভূত উন্নতি সাধন। ১৯৪৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশে ফিরে বাসভবনের কাছে মাত্র ২৮ বছর বয়সে Physical Research Laboratory প্রতিষ্ঠা করলেন

ড. বিক্রম আম্বালাল সারাভাই

১১ নভেম্বর, ১৯৪৭-এ। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য ১৯৪৭ সালেই প্রতিষ্ঠা করলেন Ahmedabad Textile Industry's Research Association। অন্যদিকে ভারতকে পরমাণু শক্তিধর বানানোর জন্য তৎকালীন ভারত সরকার ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন Department of Atomic Energy (DAE), যার প্রথম সেক্রেটারি করা হল ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবাকে।

ভারতের বিদেশনীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্বাধীনতার পরে পরেই আমেরিকার মতো একটি শক্তিধর দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক রেখে চলত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা থাকলেও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর ছিল না। এইরকম সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপ করে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। ভারতেও কৃত্রিম উপগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ড. সারাভাই তৎকালীন ভারত সরকারকে এ বিষয়ে জোর দিতে অনুরোধ জানান।

তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মহাকাশ গবেষণা ইউনিট প্রথম খোলা হয় এবং সেটি Department of Atomic Energy (DAE)-র আওতাভুক্ত করা হয়। সেই সময় DAE-র সেক্রেটারি ড. হোমি ভাবার সঙ্গে ড. সারাভাইয়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এই দুই মহান বিজ্ঞানী মিলে নবভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৬২ সালে ড. হোমি ভাবা Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ড. সারাভাইকে তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। ড. এপিজে আব্দুল কালামও সেই সময় এই INCOSPAR-এর সদস্য ছিলেন ড. সারাভাইয়ের অধীনে।

১৯৬২ সালেই ভারত-চীন যুদ্ধ হয় এবং ১৯৬৫-তে পাকিস্তান আবার কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করে। ভারত-চীন যুদ্ধে পরাজয় ও পাকিস্তানের আক্রমণে তৎকালীন ভারতের পরিস্থিতি একেবারেই সুরক্ষিত ছিল না। সেই সময় ভারতের পরমাণু শক্তিধর হওয়া নিতান্তই আবশ্যক ছিল বুঝতে পেরে ড. সারাভাই ও ড. ভাবা পরমাণু শক্তির উপর জোর দেন এবং ড. কালামকে ভারতের মিসাইল প্রজেক্টের দায়িত্ব দেন।

ড. সারাভাই সকলকে বোঝান মহাকাশ গবেষণার সাহায্যে remote sensing, meteorogy ও telecommunications-এর মতো ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সম্ভব যার ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের খবর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, আবহাওয়া পূর্বাভাস সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাওয়া যাবে। মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ড. সারাভাই ১৯৬২ সালেই কেরালার থুম্বাতে Thuma Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬-এ আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন Satellite Telecommunication Earth Station. সেই বছরই ২০ নভেম্বর, ১৯৬৭-তে সেখান থেকে ভারতের প্রথম Sounding Rocket RH-75 উৎক্ষেপ করা হয়। ▯

ভারতের মানচিত্র থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে

তরুণ কুমার পণ্ডিত

সম্প্রতি ভারতবর্ষের মানচিত্রের মাথা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে বাদ দেওয়ার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত বছরের ২০ জুন চীনের একটি মোবাইল সংস্থা ভারত থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছে। তার কিছুদিন পরই ২৮ জুন চীন টুইট করে এবং মানচিত্র এঁকে জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখকে আলাদা দেশ হিসেবে দেখায়। এ তো গেল বিদেশি দেশের ষড়যন্ত্র। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের দেশের আমাদের রাজ্যে গত ৭ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার হাজার হাজার পাঠক দেখল, ভারতের মানচিত্র থেকে দেশের মুকুট কাশ্মীর উধাও হয়ে গেছে। সেখানে উত্তর সম্পাদকীয়তে 'রাজনৈতিক ঐক্যমত জরুরি' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল, যেখানে ভারতের মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবলুপ্ত করা হয়েছে। পরেরদিন জনমতের চাপে সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হলো, কালারিং পজিসনের জন্য এই ভুল হয়েছে, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। এটা কি নিছক একটি ভুল, না সচেতনভাবে এটা করা হয়েছে? জনগণের চোখে পড়লো অথচ আনন্দবাজার কতৃক্ষের চোখে পড়ল হলো না, এটা অবিশ্বাস্য।

এদিকে হু-এর পাঠানো মানচিত্রে কাশ্মীরকে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে দেখানো হয়েছে এই অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে ২৬ জানুয়ারির পর সেই তৃণমূল সরকারের একটি ভয়ংকর পরিকল্পনা চোখে পড়ে। তৃণমূল দলের মুখপাত্র 'জাগো বাংলা' পত্রিকায় জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে। এখানে শাসক দলের দ্বিচারিতা যেমন প্রকট হয়ে পড়েছে তেমনি মুখ ও মুখোশ ধরা পড়ে গেছে। এসব কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না কি এক শ্রেণীর মানুষদের খুশি করার জন্যেই সচেতনভাবে এইভাবে বারবার জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে? তা নাহলে এইরকম একটি সংবেদনশীল বিষয়কে কেন শাসক দলের পত্রপত্রিকায় যত্নসহকারে প্রকাশ করা হচ্ছে? ভাবুন তো, ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশের মানুষ এভাবে নিজের দেশের মানচিত্র থেকে একটি রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর সাহস দেখাতে পারতো! এটা একমাত্র ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা বলেই সম্ভব। শুধু কী তাই! মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি অন লাইন প্রচারে ইতিহাসকে বিকৃত করে স্বাধীন বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুর্শিদকুলি খাঁ-কে দেখানো হয়েছে। এটাও কি এক শ্রেণীর মানুষকে খুশি করতেই এভাবে সচেতন ভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে না? এছাড়া তৃণমূল ছাত্রপরিষদ তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছবি লাগিয়ে মাইকেলের জন্মদিন পালন করছে। এটাকে জনগণ কী বলবেন! অশিক্ষিত লোকেদের নিয়ে শিক্ষিত সংগঠনের আর একটি নমুনা! না আমরা সবাই পুরুষত্বহীন মনুষ্যত্বের জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হতে চলেছি।

এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গত ২৩ জানুয়ারি রেড রোডে নেতাজীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য তুলে ধরছি, যেখানে তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করে বেশ কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন যা আমাদের দেশের মানুষের কাছে এরাজ্যের মানুষদের মাথা নীচু করে দেয়। তিনি বলেন, ঋষি অরবিন্দকে নাকি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। অথচ আমরা সবাই জানি অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরী আশ্রমে স্বাধীনতার পর বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। নেতাজীর জন্ম জয়ন্তীর দিন দাঁড়িয়ে তিনি সচেতন ভাবে আরও বলেন, ১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর বেলেঘাটা আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন তাঁর অনশন ভঙ্গ করতে। ফলের রস খাইয়ে সেদিন নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। অথচ ১৯৪১ সালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছিল। এ আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি! যেখানে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা তলানিতে, সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা এবং এক শ্রেণীর মানুষকে খুশি করতে সংবাদমাধ্যমে ও প্রশাসনের সামনে যা খুশি তাই বলে যাবে, আমরা তা মুখ বুজে সহ্য করে যাব! পশ্চিমবঙ্গের সচেতন নাগরিকদের এ সম্পর্কে ভাবার সময় এসেছে। ▯

হাঁটা প্রতিযোগিতায় ভারতের এক আন্তর্জাতিক সম্ভাবনা

কৌশিক রায়

সঙ্গত কারণেই টোকিয়ো অলিম্পিয়াডে ব্যতিক্রমী সাফল্য পাওয়ার জন্য গণমাধ্যমের নজরে এসেছেন জ্যাভেলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া, কুস্তিগির বজরং পুনিয়া ও রবিকুমার দাহিয়া, ভারোত্তোলক মীরাবাঈ চানুর মতো ক্রীড়া প্রতিভারা। তবে, পদক না জিতলেও উদ্যম, নির্ভীকতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে রাজস্থানের রাজসামন্দ জেলার কাবরা গ্রামের একটি কৃষক পরিবারের তরুণী অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯৮২-র দিল্লি এশিয়াডে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছিলেন চাঁদ রাম। ভাবনা জাট নামের এই রাজস্থানি মেয়েটি টোকিয়ো অলিম্পিয়াডে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৩২তম স্থান পেয়েছেন বটে, তবে হাঁটা প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে ভারতকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিতে এই ২৫ বছরের উদ্যোগী অ্যাথলেটি যে যথেষ্ট সম্ভাবনার অধিকারিণী— সেটা নিয়ে অনেক ক্রীড়া বিশেষজ্ঞেরই সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভাবনা জাটের খেলোয়াড় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গলে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। ২০ কিলোমিটার হাঁটা ইভেন্টে যথারীতি নাম দিয়েছিলেন ভাবনা। ৫ কিলোমিটার হাঁটার পর অসুস্থতার কারণে নাম প্রত্যাহার করে নেন তিনি। মাঠ থেকে কিন্তু বেরিয়ে যাননি ভাবনা। ভারতীয় রেলওয়েজ দলে তাঁর সতীর্থ— রাবীনা ওই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। সাইডলাইনের ধারে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে অসুস্থ ভাবনা ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছিলেন রাবিনাকে। গৌরবময়ী বিজিতা বা গ্যালান্ট লুজার হিসেবে ভাবনাকে প্রশংসা করেছে বহু গণমাধ্যম।

গ্রাম্য তনয়া ভাবনাকে যে খেলার মাঠে নিয়ে আসতে পারবেন— এটা প্রথমদিকে ভাবতে পারেননি তাঁর বাবা। রক্ষণশীল, গ্রাম্য পরিবারতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তবুও ভাবনা জেলা ও রাজ্যস্তরের হাঁটা প্রতিযোগিতাতে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ভাবনা জাটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ১৫০০ মিটার দৌড়ে ৪ মিনিট ৫.৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে জাতীয় রেকর্ড করা ২৩ বছরের হরমিলান বাইন্‌সের কৃতিত্বের। অবশ্য, হরমিলানের বংশে ক্রীড়াস্রোত বহমান। তাঁর বাবা ১৫০০ মিটার দৌড়ে সাউথ এশিয়ান গেম্‌সে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হরমিলানের মা মাধুরী সাক্সেনাও ২০২০-এর এশিয়ান গেমসে ৮০০ মিটার দৌড়ে রুপোর পদক জেতেন। ভাবনা জাটের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা ছিল না। নিজের চেষ্টাতেই ভাবনা অনেকটা দূর যেতে পেরেছেন। জাট পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা ভাবনাকে অনেকবারই সহ্য করতে হয়েছে।

২০০৮ সালে জেলাস্তরে হাঁটা প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার আগে অবশ্য এই প্রতিযোগিতাটি সম্পর্কে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না ভাবনা জাটের। তবে, দাদা প্রকাশ চন্দ্র জাটের উদ্যম ও প্রশিক্ষণের সুফল হিসেবে রেস-ওয়াকার হিসেবে জাতীয় স্তরে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছেন ভাবনা জাট। এমনকী, বোনকে তালিম দেওয়ার জন্য সময় ও অর্থ জোগাড় করতে পড়াশোনা ছেড়ে একটি বেসরকারি সংস্থাতে কাজও নিয়েছেন। ক্রিকেটে মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকর, গ্রেগ চ্যাপেল ও ট্রেভর চ্যাপেলকে এভাবেই তৈরি করেছিলেন তাঁদের দাদারা— রমেশ তেণ্ডুলকর ও ইয়ান চ্যাপেল।

ভাবনা জাটদের বাড়িতে মোবাইল ফোন ছিল না। কাকার চলভাষে ইউটিউব থেকে রেস-ওয়াকিং সম্পর্কে নিয়মিত ভিডিয়ো দেখে, কারিগরি খুঁটিনাটি দেখে নিজেকে তৈরি করেছেন ভাবনা। তাঁকে পিতৃসুলভ স্নেহে ও শাসনে কোচিং দিয়েছেন স্তরমুখ সেগ। টোকিয়ো অলিম্পিয়াডে খেলার যোগ্যতা ভাবনা অর্জন করেন ২০২০ সালে রাঁচীতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতাতে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতাতে বিজয়িনী হয়ে। এর ফলে গ্রামের মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন তিনি তাঁকে দেখে গ্রামের মেয়েরাও শর্টস ও জার্সি পরে অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।

পি.টি. ঊষা, অঞ্জু বেবি জর্জ, বুলা চৌধুরী, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, সুনীতা রানি, মেরি ডি' সুজারা ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণে যে সবলা-তরঙ্গ তৈরি করেছেন, তার নবতম ঊর্মি হলেন ভাবনা জাট। ▯

সবুজের অভিযানে কোচবিহারের বিনয় দাস

ঝুমা পাল

আজ বিশ্বজুড়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার, অরণ্য সংরক্ষণ আর বৃক্ষরোপণ তথা সবুজায়নের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে পনিয়াল গাছ, লটকা গাছ, কামরাঙ্গা গাছ, জামরুল গাছ, কদবেলের গাছ, হড়বড়ই গাছ অচেনা ও অজানা। চিনতেই পারবে না নতুন প্রজন্ম এই সুস্বাদু ফলদায়ক বৃক্ষগুলিকে। আমাদের মনে একটাই প্রশ্ন, কে বাঁচাবে অরণ্য আর জীবনদায়ী বৃক্ষগুলিকে? প্রায় উত্তরবিহীন এইসব প্রশ্ন যখন তীব্র এক মানসিক সংকট তৈরি হয় তখন স্বস্তি দেন পরিবেশপ্রেমী বিনয় দাস। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি একটি বালতি, চারাগাছ আর একটি হাছনি, ছোটো কোদাল, দা, প্লাস, গুনাতার এবং সামান্য দড়ি নিয়ে ভোর পাঁচটায় বের হন বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষ সৃজন করতে। তিনি আমাদের এলাকায় হাজার হাজার বৃক্ষরোপণ করেছেন নিজের চেষ্টায়। তোর্ষা নদীর বাঁধের ধার দিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার গাছ লাগিয়েছেন। কারও কাছ থেকে কোনো আর্থিক সহযোগিতা নেননি। মাঝে মাঝে কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ পরিচর্যার অভিযান চালান। এটা তার নিত্য সাধনা। বর্তমানে বেশিরভাগ লোক শুধু বৃক্ষরোপণ করেন কিন্তু সঠিকভাবে পরিচর্যা করেন না।

কোচবিহারের হাজরাপাড়ার বিনয় দাসের দিন শুরু হয় ভোর ৪-৩০ মিনিটে। ঘুম থেকে উঠে ৪-৩০ থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রাণায়াম করেন, তারপর বেরিয়ে পড়েন বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা করতে। এরপর ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বৃক্ষের পরিচর্যায় লেগে থাকেন, তারপর স্নান-খাওয়া সেরে ৯টায় কর্মজীবন শুরু করেন রাজবাড়ি অফিসে। তিনি চারাগাছ কিনে এক

বছর লালনপালন করেন নিজের বাড়িতে। তারপর কোনো স্থানে লাগান। বিনয় দাস সদাসর্বদা বঙ্গসংস্কৃতির গাছ লাগান। যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি। তার ভাষায় এমন গাছ লাগানো উচিত যে গাছে সকালে পাখি এসে ফল খাবে এবং গুঞ্জন করবে; মানুষ ফুল, ফল সংগ্রহ করতে পারবেন। পথচারী মানুষ স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারবেন। তিনি যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন গাছ লাগান, যেমন— রেলগেট। লালবাতির সংকেত দিলে মানুষ প্রখর রোদে ৫-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষকে স্নিগ্ধ-শীতল ছায়া দেওয়ার জন্য কোচবিহারের সমস্ত রেলগেটের কাছে বট-পাকুড় গাছ লাগিয়েছেন। কোচবিহার খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে লালবাতির ৩ মিনিট সংকেত পড়লে মানুষ অসহ্য গরমে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তাই সেখানে বিনয় দাস ও তার সহযোগীরা ৪টি বট-পাকুড় গাছ লাগিয়ে মানুষকে শীতল ছায়া দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শহরে কোনো গাছ মরে গেলে বিনয় দাস সেখানে নতুন গাছ লাগান। কোচবিহার আদালত চত্বরে গ্রামগঞ্জ থেকে বহু সাধারণ মানুষ আসেন, কখনো কখনো রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিনয় দাস জনতার রৌদ্রতাপ নিবারণ করার জন্য বট ও পাকুড় গাছ লাগিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে পাখির অবলুপ্তির একটি বড়ো কারণ হলো, ফলগাছের সংখ্যা কমে যাওয়া। তাঁর মতে পক্ষী সংরক্ষণ করতে গেলে শাল, সেগুন, গামারি, দেবদারু গাছ না লাগিয়ে ব্যাপক হারে ফলের গাছ লাগানো উচিত। মহারাজা যখন ভারতের প্রথম পরিকল্পিত শহর কোচবিহার তৈরি করেছিলেন, তখন তিনি সারা শহরে জাম গাছ লাগিয়েছেন। কোচবিহার রাসমেলার মাঠের রাস্তার ধারে ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের রাস্তার ধারে প্রচুর জামগাছ ছিল ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। আজও একটি প্রাচীন জামগাছ দেখতে পাওয়া যায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের সামনে। বাকি গাছ কেটে উধাও করে দিয়েছে। তার পরিবর্তে একটিও ফল-ফুলের গাছ লাগাননি।

তাই বিনয় দাস বিলুপ্ত জামতলা, আমতলা, লিচুতলা, চালতাতলা, তেঁতুলতলা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আগের দিনে বড়ো বড়ো গাছের নামে স্থানের নামকরণ হতো। আজকের দিনে স্থানের নামকরণ হয় প্রাণহীন ইট-পাথরের ইমারতের নামে। কোচবিহার রাজবাড়ির পিছন দিকে লিচুগাছ দিয়ে ভরা লিচুতলা ছিল, আজ লিচু গাছ নেই, তাই লিচুতলা নেই। তাই বিনয় দাস আবার লিচু গাছ লাগিয়েছেন যাতে লিচুতলা নামকরণ বজায় থাকে। এই ভাবে আমতলা, চালতাতলা, তেঁতুলতলা, জামতলা লিচুতলায় গাছ লাগিয়েছেন।

বিনয় দাসের মুখে সবসময় শোনা যায়, ২০ বছর আগে মানুষ ভাবতে পারেনি জল পয়সা দিয়ে কিনে পান করতে হবে! কিন্তু এখন পরিস্থিতি বাধ্য করছে জল পয়সা দিয়ে কিনে পান করতে। আগামী দিনে অক্সিজেন (প্রাণবায়ু) পয়সা দিয়ে কিনে গ্রহণ করতে হবে। ধনী গরিব প্রতিটি মানুষকে ছোটো একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে ২৫ বছর পর। অক্সিজেন সিলিন্ডার নাক দিয়ে টানলে কাজের এনার্জি পাবে, না হলে নিস্তেজ প্রাণী হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে! এর হাত থেকে রক্ষার উপায় বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ লালনপালন। তাই বিনয় দাসের নিত্য সাধনাকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে উৎসাহিত করা উচিত। ▮

শিবাজীর বাল্যকাল

শাহজীর পিতা মালোজী ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত। একবার স্বয়ং মহাদেব নাকি মালোজীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করব। এই আগে থেকে জিজাবাঈ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শুধু একটি প্রার্থনা করতেন ভগবানের কাছে— তাঁর শ্বশুরের স্বপ্ন যেন সার্থক হয়, বিঠোজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী যেন সফল হয়।

স্বপ্নের কথা মালোজীর ছোটো ভাই বিঠোজী জিজাবাঈকে বলেছিলেন। জিজাবাঈ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁর মধ্যে চারিদিকের পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করার অসামান্য ক্ষমত ছিল। সদ্য বিবাহিতা জিজাবাঈ দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে চিন্তা করতেন— এই দেশ আমাদের, তবু কেন আমাদের ধর্মীয় কাজকর্ম ভয়ে-ভয়ে, লুকিয়ে গোপনে করতে হয়? কেন আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ, ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে অপমানের জীবন অতিবাহিত করতে হয়? রাম ও কৃষ্ণের এই পবিত্র ভূমিতে আজ বিদেশির শাসন কেন?

নিজের শ্বশুরকে জিজাবাঈ দেখেননি। তাঁর বিয়ের চোদ্দবছর আগে মালোজী ইহলোক ত্যাগ করেন। শাহজীর কাকা বিঠোজী ভ্রাতুষ্পুত্রের বুদ্ধিদীপ্ত নববধূকে কন্যাস্নেহে বড়ো করে তুলেছিলেন। শিবাজীর জন্মের

জিজাবাঈয়ের পুত্রের জন্মের সংবাদে শিবনেরী দুর্গে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। জিজাবাঈয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল, দীর্ঘদিনের তপস্যা সফল হয়েছে, ঈশ্বর তার প্রার্থনা পূরণ করেছেন। স্বামীর চিরদিনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই পুত্রের মাধ্যমেই সার্থক হবে, মনে এই বিশ্বাস জন্মাল। জিজাবাঈ মা ভবানীর কাছে প্রার্থনা করেন, মাগো, আমার এই পুত্র যেন শুধু ভোঁসলে বংশ বা শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, সারা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে। জন্মের দ্বাদশ দিনে বালকের নামকরণ হলো। শিবের আরাধনায় জন্ম হয়েছে বলে পুত্রের নাম রাখা হলো শিবরাজে। বাড়ির বড়োরা ডাকতেন শিবা বলে। পরে লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় শিবাজী। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন— এই বালক অত্যন্ত কর্তৃত্ববান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী ও বীরপুরুষ হবে। অতি ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ম ধী-শক্তির অধিকারী হবে, অলৌকিক কার্য সম্পাদন করে ম্লেচ্ছদের নিপাত করবে এবং চারিদিকে বিজয়পতাকা উড্ডীন করবে।

ধীরে ধীরে বালক শিবা হাঁটতে শুরু করল। জিজাবাঈয়ের অবস্থা হলো মা যশোদার মতো। শিশু কৃষ্ণের মতোই চঞ্চল, চপল শিবাজী মাকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। জিজামাতা শিশুকে নিয়ে মন্দিরে যান। পুত্রের হাত দিয়ে দেবতার চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করান, নিজে পূজা করেন, পুত্রের ও দেশের মঙ্গল কামনা করেন। মায়ের ভক্তি শিবাজীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। মন্দিরে গিয়ে শিশুর আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে মা অবাক হয়ে যান। দেবতার সামনে উপস্থিত হলেই তার সব দুষ্টুমি যে কোথায় পালিয়ে যায় কে জানে। সে এক মনে মায়ের পূজা দেখে। কিন্তু দুপুর হলেই তাকে ঘুম পাড়ানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। কখন যে ছুটে পালিয়ে যায়, পাহাড়ে জঙ্গলে ছোটো ছোটো বন্ধু জুটিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠে তার হদিস পাওয়া মুশকিল।

রাতে শুয়ে মায়ের মুখে বাবা শাহজীর বীরত্বের কথা শোনে। শিশুমনের উপযুক্ত ভাষায় মা তাকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি শোনান। মা'র মুখে গল্প শুনতে শুনতে শিবাজী ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের বেলায় খেলার সময়ে পাথরের টুকরো সাজিয়ে কেল্লা তৈরি করে। গাছের সরু ডাল বা কঞ্চি হয় তার তলোয়ার। তারপর বন্ধুরা মিলে শুরু হয় কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ। কচি কচি কণ্ঠের 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে বনভূমি কেঁপে ওঠে। শত্রুর কেল্লা ধ্বংস করে ঘেমে নেয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে যখন বিজয়ী বীর মায়ের কাছে ফিরে আসে তখন সেই বিরাট যুদ্ধের বর্ণনা শুনে মা বড়ো বড়ো চোখে পুত্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন

মা ভবানী তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। বড়ো হয়ে জিজাবাঈয়ের এই পুত্র হিন্দুপদপাদশাহি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শাশ্বত ভারত থেকে

ভারতের বিপ্লবী

নির্মলজীবন ঘোষ

বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ ১৯১৬ সালের ৫ জানুয়ারি হুগলী জেলার ধামসিনে জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মেদিনীপুরের অচ্যাচারী জেলা শাসক বার্জকে গুলি করে হত্যায় অংশগ্রহণ করেন। ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩৪ সালের ২৬ অক্টোবর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কী?

- সংগীতের দেবী বলা হয় মা সরস্বতীকে।
- ভারতের প্রাচীনতম বাদ্য হলো বীণা।
- ভারতের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'(১৯১৩)।
- ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলমআরা' (১৯৩১)।
- বাংলায় প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল'(১৯১৯)।
- প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' (১৯৩১)।
- ভারতে চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় দাদাসাহেব ফালকে-কে।

ভালো কথা

বাঘিয়ার প্রভুভক্তি

এই গল্পটি আমি আমার দাদার কাছে শুনেছিলাম। নবাঙ্কুরের বন্ধুদের জন্য এটি শেয়ার করলাম। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বাঘিয়া নামে একট কুকুর ছিল। মারাঠি ভাষায় বাঘিয়া মানে বাঘ। এই বাঘিয়া খুব প্রভুভক্ত ছিল। সবসময় শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। বাঘিয়ার ভয়ে কোনো শত্রু শিবাজীর ধারে কাছে আসতে পারত না। শিবাজীর মৃত্যু হলে বাঘিয়া সারাদিন কিছু না খেয়ে শুধু কাঁদতে থাকে।। কাঁদতে কাঁদতে শিবাজীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মত্যুবরণ করে। রায়গড় দুর্গে শিবাজীর সমাধিস্থলের কাছেই বাঘিয়ার মূর্তি রয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা একবার রায়গড় দুর্গ দেখার।

পূজাঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণী, কাছারীছড়া, দামছড়া, ত্রিপুরা ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রার্থনা

রাজশ্রী ঘোষ, একাদশ শ্রেণী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

মা সরস্বতী
তোমায় করি মিনতি,
একবার পড়লে তবে
সবই যেন মনে থাকে।
সারাদিন পড়ি আমি
খেলাধুলা সবই ছেড়ে,
এত পড়ি তবু কেন
পরীক্ষায় যাই যে হেরে।

সরস্বতী সরস্বতী
তুমি তো মা বিদ্যার দেবী,
সারাদিন পড়লে পরেও
ভুলে কেন যাই সবই।
আশীর্বাদ করো মাগো
মন দিয়ে পড়বো আমি,
বিদ্যার দেবী মাগো তুমি
বিফল হবো কেন আমি?

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

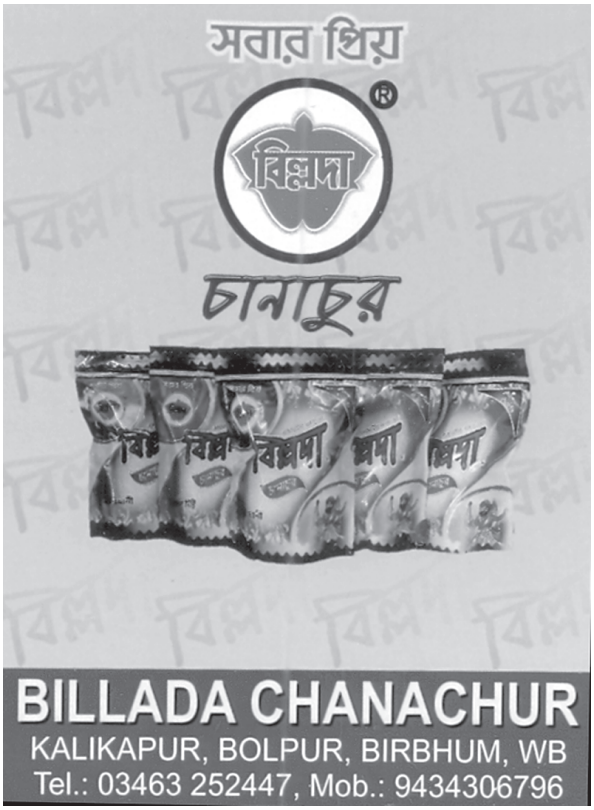

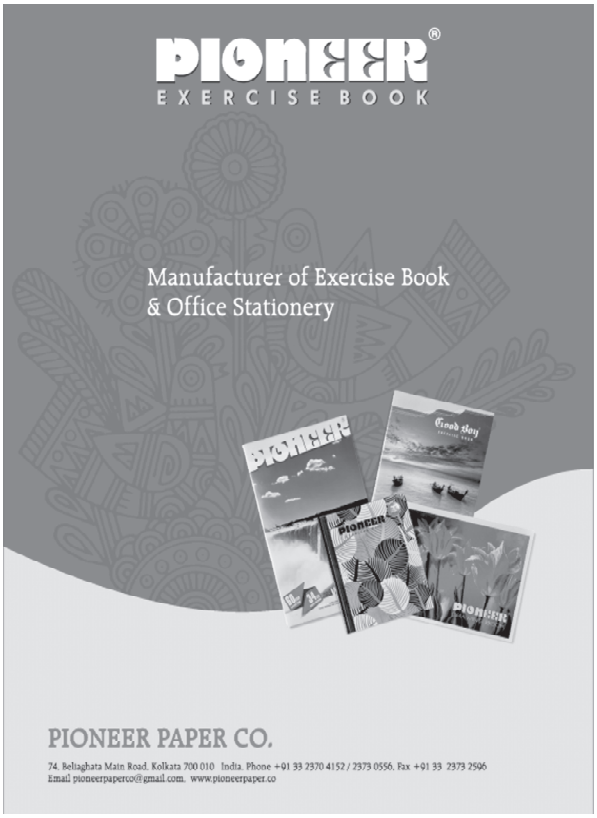

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সব জেনেবুঝে তবেই মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখবেন

শেখর সেনগুপ্ত

দেশে যেহেতু এখন এক মজবুত সরকার, তাই গত ৫ বছরে মিউচুয়াল ফান্ডে কম-বেশি বিভিন্ন আয়ের মানুষদের লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে ৩ গুণেরও বেশি। আর মিউচুয়াল ফান্ডগুলির গত ১০ বছরে AUM (Assets Under Management) বৃদ্ধি পেয়েছে পাক্কা ছ' গুণ। মোদী সরকারের বাজেটের নিন্দায় গলা তোলার সময় বিরোধী দলগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করবে আর্থিক উন্নয়নের এই নজিরটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে। করোনা ওমিক্রনের ঝাপটায় সারা দেশের আবহ যখন প্রকৃতই প্রতিকূল, তখন ইত্যাকার ইতিবাচক

দিকগুলিকে প্রায়শ সারশূন্য গঞ্জনায় ভরে তোলার প্রয়াস বিরোধীদের একটা সহজাত প্রয়াস রূপে ধ্বনিত হবেই, এটাই যেন এই দেশের ধারবাহিক গণতান্ত্রিক চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে হিসেব কষে দেখা গিয়েছিল, দেশের মিউচুয়াল ফান্ডগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে মোট ১৬.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২১-এর শেষে তা দাঁড়িয়েছে ৪৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। লকডাউন ইত্যাদির কবলে পড়ে বাজারের চারিদিক যখন অন্ধকার, তখন মিউচুয়াল ফান্ডের অগ্রগমন ঘটছে অনেকটা যেন রাজকীয় স্টাইলেই। সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করতেই মানুষ এখন সবিশেষ উৎসাহী। ওই প্ল্যানগুলিতে মধ্যবিত্তরা যেভাবে নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তা বহুলাংশে এই সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের নজির হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। সচেতন মানুষদের ফেসবুক প্রোফাইল চর্চা করলেও আমরা সেই আস্থারই সন্ধান পাই, যা ইউপিএ জমানায় আমি দেখতে পাইনি। তবুও আমার প্রত্যাশা; মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে আরও বেশি বেশি করে চর্চা করুক। অন্যান্য ডিপোজিট স্কিমের সঙ্গে এর ফারাকটা কোথায় কতটা, তা প্রত্যেককে বুঝতে হবে নিজের স্বার্থে।

যাঁরা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন কিংবা নিকট ভবিষ্যতে অবসর নিতে চলেছেন, লাভজনক লগ্নির ক্ষেত্ররূপে তাঁরা মিউচুয়াল ফান্ডকে স্বাভাবিক কারণেই চিহ্নিত করতে পারেন। এক দশকেরও বেশি সময় আগে 'সেবি' (Securities and Exchange Board of India) মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করবার পদ্ধতিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজতর করে দিয়েছে এবং এখন এই বিনিয়োগকে আর ঠিক দৈবনির্বন্ধের বশীভূত বলা যাবে না। বরং কোন ফান্ডের কী চরিত্র, ভালোভাবে চর্চা করা থাকলে ঝুঁকির প্রাবল্য থেকে নিজেকে বিলক্ষণ সুরক্ষিত রাখা যায়। তথাপি এ বার্তা সর্বজনবিদিত যে, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ভাবনা ও অঙ্ক কষার বিষয়। বাস্তবে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ হয়ে থাকে দু' ভাবে :

(ক) ঝুঁকিশূন্য বিনিয়োগ, (খ) ঝুঁকিযুক্ত বিনিয়োগ।

সেবি বিনিয়োগের পথটিকে মসৃণ করতে চাইলেও যে সমস্ত কারণে মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা ঢালে, সেই সমস্ত কারণের চরিত্র অপরিবর্তিত রয়েছে। লগ্নিকারীদের প্রতি প্রতিশ্রুতিরক্ষার্থে মিউচুয়াল ফান্ডকে মার্কেট রিস্ক নিতেই হয়। তাই লগ্নিকারীদেরও স্মরণে রাখা দরকার যে, বাজারের হালত যদি বিগড়ে যায়, তাদের প্রত্যাশা চোট খেতে বাধ্য। অর্থনীতির ব্যাখ্যায় বসে এই কথাটা আমি সবসময়ই বিনিয়োগকারীদের বলে থাকি যে, আপনি আপনার নিজস্বতা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। আপনারা কেউ কারোর কার্বনকপি নন। বয়স, অভিজ্ঞতা, জীবনযাত্রা, চাহিদা, দায়দায়িত্ব— সব কিছুতেই পার্থক্য থাকতে পারে। এই বিষয়গুলিই সংশ্লিষ্ট মানুষকে ভাবাবে, কোন ফান্ডটিতে বিনিয়োগ করা আমার পক্ষে উচিত অথবা অনুচিত। এমনও হয় লগ্নির সময়ে প্রাপ্তির যে সম্ভাব্য উচ্চতা আকর্ষণ তৈরি করেছিল, মন্দা বাজারের অভিঘাতে তার অনেকটাই চূর্ণ। সেই সময়ে যা ছিল প্রধান, কালের প্রভাবে তা এখন নিতান্ত অপ্রধান। এই ধরনের মারাত্মক বিপরীতগতি মিউচুয়াল ফান্ডের ভুবনে কালেভদ্রে ঘটেই থাকে।

বছর বছর নতুন ধরনের ফান্ডের আগমনবার্তা আমরা পেয়ে থাকি বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাধ্যমের দৌলতে। এদের মধ্যে কোনটি পোক্ত, আর কোনটিতে ভরসা কম, বুঝে নিতে ভুল হলে পরে পস্তাতে হতেই পারে। তাই বিনিয়োগের আগে বিচার করে দেখুন, কী ধরনের ফান্ড আপনার পক্ষে উপযুক্ত হবে? এর হদিশ পেতে আপনাকে নিবিষ্ট সন্ধানীর ব্রত নিয়ে জানতে হবে, এই সময়ে কোন কোন জাতের ফান্ড বাজারে সঞ্চালকের ভূমিকায় রয়েছে। ক্রমে অনুধাবন করতে পারবেন যে বাজারে দুই চরিত্রের ফান্ড নিজেদের অধিকার কায়েম রেখেছে। প্রথম ধরনের ফান্ড মুখ্যত ইক্যুইটিতে অর্থাৎ শেয়ারবাজারে মূলধন খাটাচ্ছে। দ্বিতীয় জাতের ফান্ড 'ডেট' অর্থাৎ বন্ড ও ডিবেঞ্চারে খাটাচ্ছে তাদের টাকার সিংহভাগ। প্রথম দল ঝুঁকির ঝক্কি নিয়ে ভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে চায়। দ্বিতীয় দল নিরাপত্তার থিওরিতে অটল থেকে মোটামুটি লাভের অঙ্ক ঘরে তুলতে পারলেই খুশি।

মিউচুয়াল ফান্ডে আপনি যদি লগ্নি করতে চান, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আগে নিজেকে যথাযথভাবে অবহিত করুন :

প্রথমত, মিউচুয়াল ফান্ড মাত্রই কম-বেশি ঝুঁকি নিয়ে বাজারে বিচরণ করে থাকে। তখন ভালো-মন্দ কিছু একটা ঘটতেই পারে। যে ফান্ড ঝুঁকি ও ঝুঁকিশূন্য উভয় সেক্টরেই বিনিয়োগ করে থাকে, সে কখনও হাঁসফাঁস করতে করতে একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায় না; আবার পর্বতপ্রমাণ লাভের অঙ্কে রাতারাতি স্ফীতকায় হয়ে ওঠাও তার নসিবে নেই।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখবেন— অতি বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার সামর্থ্যের পরিধি সুবিস্তৃত, অনেক সময় এরকম সংস্থাও মিউচুয়াল ফান্ডিং কারবারে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এইচ.ডি.এফ.সি, আইসি আইসিআই, এলআইসি, জিআইসি, রিলায়েন্স, টাটা ইত্যাদি।

এবার এদের লোগো ব্যবহার করেও কিছু ফান্ড বাজারে বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় থাকে, যদিও আর্থিক বিপর্যয়ের দায় সংশ্লিষ্ট বৃহৎ কোম্পানিগুলি সচরাচর বহন করে না। তাই প্রতিটি ফান্ডকে একটি পৃথক স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান রূপেই ভেবে নিতে হবে, যার পরিচালনে ভুল সিদ্ধান্ত কিংবা স্বেচ্ছাচারের প্রাধান্য থাকলে বিনিয়োগকারীকে ভুগতে হতেই পারে। আরও বড়োভাবে বলা যায়, আজকের দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা যেমন তীব্র, উত্থান-পতনের সম্ভাবনা তেমনি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপেই গ্রাহ্য। কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরই চিরায়ত জাদুকরী ক্ষমতা সচরাচর থাকে না।

আপনি একজন বিনিয়োগে ইচ্ছুক ব্যক্তিরূপে যা করতে পারেন, তা হলো একটি রিস্ক প্রোফাইল নির্মাণ। এমন প্রোফাইল নয় যে আস্ত বাজারটাই সেখানে ঢুকে যাবে। দেদার কোম্পানিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার পরিবর্তে কতগুলি জরুরি প্রশ্ন তৈরি করুন। তারপর ওই প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরি করুন। নির্ভেজাল শ্রমসাধ্য কর্ম। রুমালে নাক চাপা দিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

বেশি নয়। মাত্র চারটি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন আপনার আর্থিক সামর্থ্য কতটুকু— যে সামর্থ্য আপনাকে সদম্ভে নয়, যথার্থ বিবেচকের মতো ঝুঁকি নিতে সাহায্য করতে পারে? ঝুঁকি সামান্যও হতে পারে। আবার তা যাবজ্জীবনের ঝুঁকিও হতে পারে। সুতরাং খুব হিসেব কষে এই প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখবেন আপনার প্রোফাইলে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি কী শেয়ারমার্কেটের খবরাখবর রাখেন? যদি রাখেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় ওই বাজারের ওঠা-নামা সম্পর্কে ভালোই ওয়াকিবহাল। তাই ইক্যুইটিনির্ভর ফান্ডের দিকে কি ঝুঁকবেন অথবা ঝুঁকলেও কত শতাংশ ঝুঁকবেন, সে ব্যাপারে নিজেকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তরটি খুঁজে লিখে রাখুন। আর আপনি ঝুঁকি নিতে যদি অরাজি থাকেন, তাহলে চলে যেতে পারেন ফান্ড 'ডেট'-এর দিকে, যেখানে প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃহৎ না হলেও বিনিয়োগের সেফটি ও স্টেবিলিটি আশ্বাসদায়ক। তৃতীয় প্রশ্ন, আপনি কি বর্তমানে সেই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, যখন আপনার নিয়মিত নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা চাই? বিনিয়োগ করবেন তখনই, যখন ওই ধরনের ইনকাম রেগুলার আসতে থাকবে। এর বিপরীতে আপনি হয়তো চাইছেন, এখন নয়, বিনিয়োগ থেকে বড়ো রিটার্ন আমার ভবিষ্যতে এলেই ভালো। অর্থাৎ আপনি অপেক্ষা করতে সক্ষম। ভেবেচিন্তে লিখে রাখুন, আপনি কী চান?

চতুর্থত, আপনার এই বিনিয়োগ কত সময়ের জন্য হলে নিজের অসুবিধে হবে না, তা ভেবে স্থির করুন। টাকা এ যুগে মানুষের লাইফলাইন। সেই টাকার একটা অংশকে কোথাও গচ্ছিত রেখে তাকে তাগড়া করে তুলতে হলে নিজেকে কম-বেশি কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবেন তো? এটা কিন্তু আবার একটা ধৈর্যের পরীক্ষাও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বুঝেশুনে ঠিক করবেন, কত সময়ের জন্য আপনি আপনার টাকাকে বর্তমানে ব্যয় না করে অন্যত্র জমা রাখতে পারছেন? এই হিসেবটা বের করা খুব জরুরি। অবশ্য যাঁদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, তাঁরা এ নিয়ে ভাবেনটাবেন কম।

এবং পরের কথা হলো, যে ফান্ডে টাকা রাখতে চাই, তার

সামর্থ্যকে যাচাই করবার সহজ কোনও উপায় আছে কী?

আছে। উপায়টা সরলই। কেবল দুনিয়াব্যাপী বিজ্ঞাপন দেখে মোহিত হবেন না। বিজাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করেছিল মহা অনর্থ সৃষ্টিকারী চিটফান্ড সারদাও।

মন ও নজরকে সন্ধানী রাখুন। কাউকেই পরশপাথর ভেবে অগ্রসর হবেন না। বিশদভাবে জানবার চেষ্টা করুন, কোন মিউচুয়াল ফান্ডের এনএভি এই মুহূর্তে প্রকৃতই শক্তপোক্ত। তবে এনএভি নিয়ে চর্চা করবার আগে সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্র্যাক রেকর্ডটিও একটু জেনে নেবেন। ভুঁইফোঁড় কোম্পানিকে বিবেচনার মধ্যে না রাখাটা বিধেয়। অর্থাৎ উক্ত ফান্ডের প্রমোটাররা যদি বাজারে অপরিচিত নাম হন, তাঁদের সঙ্গে একটা গা ছমছম দূরত্ব বজায় রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি এ কারবারে আপনি প্রকৃতই নবিশ হয়ে থাকেন, ভিরমি না খেয়ে অভিজ্ঞ জনের পরামর্শ মোতাবেক চলুন।

NAV (Net assets value)-কে কীভাবে বিশ্লেষণ করা বিধেয়, আমি একটি কৌশল এখানে বাতলাচ্ছি, যার সাহায্যে বিষয়টিতে পাঠকের প্রত্যাশপূরণ অনেকটা নিশ্চিত হতে পারে।

উদাহরণটি এই রকম :

ধরা যাক, মিউচুয়াল ফান্ডটির নাম 'ক'। বাজারে এর পরিচিতি যথেষ্ট। এই ফান্ডটি বাজারে ১ লক্ষ ২০ হাজার ইউনিট ছেড়ে সংগ্রহ করেছে ২২ লক্ষ টাকা। টাকাটা খাটানো হলো শেয়ারবাজার এবং অন্যান্য সম্পদে। ধরা যাক, এক বছর বাদে ওই বিনিয়োগের বাজারমূল্য গিয়ে দাঁড়াল ১৮ লক্ষ টাকায়। তখন সেই 'ক' মিউচুয়াল ফান্ডের এনএভি আমরা বের করব নিম্নোক্ত আঙ্কিক উপায়ে :

১৮ × ১.২ (বিক্রিত ইউনিট লক্ষের হিসেবে)

$= ১৮ \times \frac{১১২}{২০} = ১৫$ লক্ষ টাকা।

যে কোম্পানির এনএভি যত বেশি, সেই কোম্পানি এই মুহূর্তে তত সমর্থ। তথাপি যেহেতু এটা মিউচুয়াল ফান্ড, ঝুঁকি থাকবেই। এবং আপনি নিজের রিস্ক অ্যাপেটাইটটাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে নেবেন, ওপরের চারটি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে।

উত্তর খোঁজার সময় ভালোভাবে মেপে নেবেন নিজের বয়স, রোজগার ও দায়িত্বের পরিমাণ। যদি বয়স কম হয়, যখন আপনার সামনে অনেকটা সময় পড়ে রয়েছে, আপনার লগ্নি হতে পারে তুলনায় স্বল্পকালীন, বা তুলনায় অধিক ঝুঁকিবহুল। আর বয়স যদি হয় পড়তির দিকে, ঝুঁকি কম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে আর একটা জরুরি পরামর্শকে মান্যতা দেওয়া উচিত। মিউচুয়ালফান্ডেই আপনার সব টাকা ঢেলে দেবেন না— তা সে যতই নামজাদা হোক না কেন। এজেন্ট বা পরিচিতজনের পীড়াপীড়ি এড়িয়ে নিজের সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করুন মিউচুয়াল ফান্ড সমেত আরও পাঁচ-সাত রকমের প্রকল্পে।

মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিম দু' ধরনের— Open ended scheme এবং Close ended scheme. Open ended fund আবার ইস্যু ছাড়তে পারে। কিন্তু Close ended fund নতুন ইস্যু বের করতে পারে না, বোনাস ও রাইটাস ইস্যু ছাড়া। এ কারণে Open ended fund-এর Unit Capital প্রতিদিন ওঠা-নামা করতে পারে। Close ended scheme-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না।

তদনুযায়ী যে কোনও বিনিয়োগকারী সেই দিনের Asset value ও দামের অবস্থা দেখে Open ended fund-এর ইউনিট খরিদ করতে পারেন। Close ended scheme-এর সেই বিশেষ দিনের পরিস্থিতি তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নবীন বিনিয়োগকারীদের কাছে এই অবস্থাটা অগ্রহণীয় কিংবা দুর্বিষহ মনে হলেও হতে পারে। তবে তাঁরা সেকেন্ডারি মার্কেট-এ ঢুকে ওই রকম ইউনিট কিনে রাখতে পারেন। ফান্ডে বিনিয়োগ করবার আগে সব রকমের খবরাখবর সংগ্রহ করবার চেষ্টায় থাকবেন। এই বিষয়ে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখতে ফান্ডের ওয়েবসাইটে মন দিতে পারেন। ওয়েবসাইটে যে সমস্ত তথ্য থাকে, সেইগুলিকে অকেজো মনে করবার হেতু কম। সেখানে থাকে ফান্ডের অতীত ও বর্তমানের পারফরমেন্সের তথ্যাদি। প্রতি মাসের পোর্টফোলিওতে সাঁতরে ফান্ডের গতিমুখেরও নির্ঘাত হদিশ পেয়ে যাবেন। অন্যের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেই স্বাদ গ্রহণে তৎপর হলে সবচেয়ে ভালো। কারণ বিজ্ঞাপনচর্চিত এই দুনিয়ায় গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ছড়াছড়ি। লোকে বিনিয়োগ করে কেবল মাত্র দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের জন্য নয়। জীবনকে আরও অনেক কিছু লোভনীয় বস্তুর জোগান দিতেও। এই সমস্ত চাহিদার সলিউশন তো মিউচুয়াল ফান্ডগুলি দিতে পারে। তবে ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারে না গিয়েও বলা যায়, মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামান ছোটো বিনিয়োগকারীরা। আমি দেখেছি, প্রবীণরা সাধারণত এইটে প্রকাশ করতেই মুখিয়ে থাকেন যে, এককলীন বিনিয়োগ করে প্রতিমাসে সেই বিনিয়োগ থেকে যথাসম্ভব বেশি টাকা যেন হাতে আসে। না হলেই বিষণ্ণতা কিংবা মানসিক অস্থিরতা। মিউচুয়াল ফান্ডে রয়েছে বহুবিধ স্কিম। যাঁদের বয়স অনেক, তাঁদের পক্ষে যাবতীয় পরিস্থিতি এবং ইতিবৃত্ত চর্চা করে শেয়ারবাজারে লগ্নি করাটা সত্যি বেশি কঠিন। কিন্তু এঁরা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে অপ্রত্যক্ষভাবে শেয়ার বাজারের লাভ অনেকটাই ঘরে তুলতে পারেন। ইক্যুইটি মার্কেটের ফেনোমেশন আপনাকে দখল করল না, অথচ আপনি বিনিয়োগের আংশিক সুবিধা পেয়ে গেলেন। ঝুঁকি থাকলেও কখনও একেবারে মাঠে মারা যাবে না। মিউচুয়াল সংস্থা তার ফান্ডের যে অংশ স্কিম অনুসারে বন্ডে বিনিয়োগ করে থাকে, সেখান থেকে আয় কম হলেও নিরাপত্তাকে ষোলো আনাই অটুট ভাবা যেতে পারে।

ওই উপার্জনে যতটা সম্ভব সন্তুষ্ট থাকবার চেষ্টা করুন। আনন্দ অনুষ্ঠানেও যোগ দিন। নিরাপত্তাদায়ক ওই সকল বন্ডগুলি ইস্যু করে থাকে দেশের সরকার এবং বড়ো বড়ো কর্পোরেট হাউসগুলি। কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আমলে এরা কাস্টোমার বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের উজ্জ্বল মুখে কালি লেপন করে না। কালি লেপনের যত ঘটনা ঘটেছে আজ অবধি, সবই কংগ্রেস আমলে। ইতিহাসকে পাশে না রেখে আমি অর্থনীতির চর্চায় ঢুকে পড়ি না কদাপি।

এছাড়া রয়েছে মিউনিসিপ্যাল বন্ডস। বিভিন্ন পুরসভাও প্রয়োজনে বাজারে বন্ড ইস্যু করে থাকে। এই গুলিকেও নিশ্চয় বিশ্বাস

করা চলে, যেহেতু এদের পিছনেও রয়েছেন বরাভয়প্রদানকারী সৎ সরকার। এদের নিকট টাকা খাটিয়ে কেউ কপাল চাপড়েছেন বলে কোনও সাম্প্রতিক ইতিহাস আমার জানা নেই।

বর্তমানে আমাদের দেশের মিউচুয়াল ফান্ডগুলির হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা। করোনাক্রান্ত কালেও বিজেপি সরকারের খর নজরদারিহেতু বিনিয়োগকারীরা বিপন্ন হয়ে পড়েননি কোথাও। এটা সেই হর্ষদ মেহেতার 'স্বর্ণযুগ' নয়। এই সরকারের বিত্তদপ্তরের হাতে রয়েছে যুগপৎ দূরবিণ এবং যষ্ঠী। আগামীদিনে দেশ সার্থকতার সঙ্গে সমৃদ্ধতর হবেই। আমার সংগ্রহে রয়েছে বছর কয়েক আগের Value Rescarch India দ্বারা প্রচারিত একটি অতি মূল্যবান সমীক্ষা, যেখানে এই দেশের প্রধান ১৫টি মিউচুয়াল ফান্ডের হেপাজতে থাকা অর্থের পরিমাণ পরীক্ষিত। বর্তমানে ওই আর্থিক চিত্রটি আরও অনেক উজ্জ্বল :

কতগুলি ফান্ডের নাম এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের হেপাজতে রয়েছে যত টাকা (কোটির হিসেবে)

১. ইউ টি আই মিউচুয়াল ফান্ড—	৩০,৪৪৪৩৭৫
২. প্রুডেনশিয়াল আই সি আই সি আই—	২৫১৮৪৮৩
৩. এইচ ডি এফ সি মিউচুয়াল ফান্ড—	২৩৭০৯৮৬
৪. বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ড—	৮৭২৯০৪
৫. রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ড—	১৮১২৯৮৫
৬. টাটা মিউচুয়াল ফান্ড—	১৭২৭৭৯২
৭.এইচ ডি এফ সি মিউচুয়াল ফান্ড—	১৫৫৬৯৬১
৮. কোটাক মাহিন্দ্রা মিউচুয়াল ফান্ড—	১২৪৭৯৫১
৯. এস বি আই মিউচুয়াল ফান্ড—	১৩১৫০৫১
১০. এল আই সি মিউচুয়াল ফান্ড—	৭১৮৩১৭
১১. আই এন জি বৈশ্য মিউচুয়াল ফান্ড—	৪৯২৫১৭
১২. সুন্দরম্ মিউচুয়াল ফান্ড—	৩৮৭১৪২
১৩. মরগান স্ট্যানলে মিউচুয়াল ফান্ড—	২৬৪০৪৭
১৪. সাহারা মিউচুয়াল ফান্ড—	৩১১৮৯
১৫. ডি আই জি মিউচুয়াল ফান্ড—	২৭২০৯

এবার জানাচ্ছি মিউচুয়াল ফান্ডের সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্টের কথা। এটা মাসে মাসে রেকারিং ডিপোজিটের সমকক্ষ। এবং মেয়াদশেষে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাব্য পরিমাণ বিপুলতর। চোলামণ্ডলম ইক্যুইটি ফান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ মি. শশীকৃষ্ণন ব্যাখ্যা করেছেন : Whether you get into an equity fund you are basically looking at staying invested for a long time horizon, say 3 to 5 years, where the Systematic Investment is the best for fixed income group people.' মাসে মাত্র ১ হাজার টাকা নিয়মিত লগ্নি করে গেলে ৫ বছর বাদে যে সকল ইক্যুইটিলিকুইড ফান্ড বিনিয়োগকারীদের চমকপ্রদ রিটার্ন দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাদের পরিচিতি এবং সম্ভাব্য রিটার্নের পরিমাণ (বছর পাঁচেক আগের) এখানে আমি উল্লেখ করলাম। আপনারা খোঁজ নিয়ে এই মুহূর্তের অঙ্কটা জেনে নিতে পারেন।

পাঁচ বছর বাদে সর্বাধিক যে পরিমাণ টাকা পেতে পারেন সংশ্লিষ্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্টের নিকট হতে

স্কিমের নাম	টাকা
বিলায়েন্স গ্রোথ	২,৪১,৭২৯.৬২
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া প্রাইমা	২,৩৩,১৯৫.৯১
ম্যাগমা কন্ট্রা	২,২২০৯৯.৪৯
রিলায়েন্স মিশন	২,০৭,২৯২.২০
ম্যাগনাম গ্লোবাল	১,৮৫,৩২৩.৫৩
অ্যালান্স বেসিক ইন্ডাস্ট্রিস	১,৭২,৬৫৯.৬০
এইচ ডি এফ সি টপ ২০০	১,৬৯,৫৪৩.৬০
অ্যালান্স ইক্যুইটি	১,৬৫,২৬৩.৪৬
এইচ ডি এফ সি ক্যাপিটেল বিল্ডার	১,৬৪,২৬৬.৪৬
ইউ টি আই গ্রোথ ভ্যালু	১,৪৭,০২৬.০৯
টাটা লাইফ সেনসেক্স অ্যান্ড টেক	১,৩৮,৭২২.২৫

প্রাপ্তির চিত্র যতই আকর্ষক হোক না কেন, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের আগে নিম্নোক্ত পরামর্শকে মান্যতা দিতে অনুরোধ জানাই :

(ক) অপরের কথায় অধিক প্রভাবিত হবেন না। বিনিয়োগ সম্পর্কে সাহা বিশ্ব যে অর্থনীতিবিদকে কুর্নীশ ঠুকেথাকে বারবার সেই ওয়ারেন বাফেটই বলেছেন, 'Be fearful when others are gready and be greedy when others are fearful.

(খ) নিজেকে সাধ্যমতো ওয়াকিবহাল রাখুন লগ্নির আগে। টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার মেহেরাব ইরানি মিউচুয়াল ফান্ডের সম্ভাব্য লগ্নিকারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'Please take informed decision'। হক কথা। যে ফান্ডে টাকা রাখতে যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে খোঁজ নিন। এর টাকা কোথায় কোথায় খাটছে, কত তার asseet value, ম্যানেজমেন্টে কারা রয়েছেন, তা জানুন এবং ভালোভাবে চর্চা করুন। প্রয়োজনে একজন Financial adviser-এর সহায়তা নিন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে, এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর এখানে জানাচ্ছি।

কোম্পানির নাম		টেলিফোন নম্বর
এইচ ডি এফ সি ফান্ড	—	(০৩৩) ২২১৩৯৯১১
বাজাজ অ্যালায়েন্স	—	১৮০০ ২৩৩৭২৭২
সুন্দরম্ বি এন পি পরিকাস	—	(০৪৪) ২৮৫৭৮৭০০
রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ড	—	১৮০০ ৪২৫৫৪৭৫
ইউ টি আই সি ফান্ড	—	১৮০০ ২২ ১২ ৩০

অসুবিধে হলে অনলাইনে সন্ধান নিন।

দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি প্রতিকূলতার মধ্যেও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দেশের অর্থনীতিকে কেবল সতেজ রাখেনি, সঠিক পথে চালিত রেখেছে। মিউচুয়াল ফান্ডগুলিও তাই যথার্থ সতেজ এবং এই মুহূর্তে প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম। বিরোধী বিশারদদের সমালোচনা বহুলাংশে বায়বীয় মাত্র।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

উত্তর ভারতের ক্রীড়া কেন্দ্র হয়ে উঠছে মিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিখ্যাত বিপ্লবী মঙ্গল পাণ্ডের জন্মস্থান মিরাট ক্রীড়া জগতেও সুপরিচিত। এই রাজ্যে তৈরি ক্রীড়া সামগ্রী, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। মিরাট উত্তর ভারতের নতুন ক্রীড়া রাজধানী হতে চলেছে। মিরাটের সারধানায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি নির্মিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন বছরের শুরুতে ২ জানুয়ারি এই ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রতিভার অধিকারী এবং সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রমেরও অন্ত ছিল না। তবে সরকারের উদাসীনতার কারণে আমাদের তরুণদের প্রতিভা যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি। হকি এর একটি বড়ো উদাহরণ। হকিতে সোনার জন্য আমাদের কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যেখানে মেজর ধ্যানচাঁদের মতো ক্রীড়া প্রতিভা আমাদের দেশে ছিল। দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতি করতে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। দেশের পূর্ববর্তী সরকারগুলি এমন একটি ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল যা নতুন প্রযুক্তি, চাহিদা এবং প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। ২০১৪ সালের পর, সরকার এটিকে শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বস্তরে পরিবর্তন সাধন করেছে। সম্পদ, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্লোবাল এক্সপোজার এবং নির্বাচনের স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। খেলাধুলাকে যুবকদের ফিটনেস, কর্মসংস্থান এবং কর্মজীবনের সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য 'টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম' স্কিম (টপস) চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রচারের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে সম্ভাব্য প্রতিভা খুঁজে আনা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতের খেলোয়াড়রা আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসিত হচ্ছেন। বিশ্ব তাঁদের খেলার প্রশংসা করেছে। এই বিষয়টি আমরা গত বছর অলিম্পিক এবং প্যারাঅলিম্পিকেও দেখেছি। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রীড়া সংস্কৃতি বিকাশের জন্য ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করে। সেই কারণেই স্বাধীনতার সাত দশক পর, আমাদের সরকার ২০১৮ সালে মণিপুরের প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে।

ভারত অন্যতম প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্ব যখন কোভিডের আক্রমণে বিপর্যস্ত, ভারত তখন সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সুচিন্তা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগে রূপান্তরিত করেছিল। সরকার বেশ কয়েকটি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য মূলত কৃষি এবং ছোটো ও মাঝারি ব্যবসাকে সহায়তা করা। দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনার কারণে, ডেয়ারি প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ডিআইডিএফ)-এর অধীনে এই খাতে বিশেষ অভিনিবেশ করা হয়েছে। দুগ্ধ খাতের আধুনিকীকরণে সহায়তা করার জন্য সরকার কর্তৃক ডিআইডিএফ গঠন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ সালে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮.৪ মিলিয়ন টনে পরিণত হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে ২০২৪ সাল নাগাদ, দুধ উৎপাদন ৩৩০ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে। বর্তমানে ২০-২৫ শতাংশ দুধ প্রক্রিয়াজাত করা হলেও সরকার তা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে, জাপানের পরিবর্তে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, চীন, জাপান, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যের পরে ভারত হলো বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। আইএইচএস মার্কিট- এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালের ভারতের জিডিপি ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮.৪ ট্রিলিয়ন ডলার হবে। আইএইচএস মার্কিটের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১-২২ আর্থিক বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৮.২ শতাংশ, যা কোভিড চলাকালীন লকডাউনের সময় ৭.৩ শতাংশে নেমে গিয়েছিল।

আইএইচএস মার্কিট হলো বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি চালিত প্রধান শিল্প এবং বাজারগুলির জন্য তথ্য, বিশ্লেষণ এবং সমাধানের একটি বিশ্বব্যাপী মঞ্চ।

অটল পেনশন যোজনায় ৬৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ নথিভুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে কেন্দ্রের অটল পেনশন যোজনার অধীনে এখনও পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন। গত সাড়ে ছয় বছরে মোট ৩.৬৮ কোটি মানুষ এই স্কিমে নথিভুক্তি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে কেন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন, এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল

বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের নাগরিকদের বৃদ্ধ বয়সের আয় সুরক্ষা প্রদান করা।

এই স্কিমটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে ঝুঁকি রোধ এবং সেই ক্ষেত্রের কর্মীদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের জন্য সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করে। এই পেনশন স্কিমে ১৮-৪০ বছর বয়সি যে কোনও ভারতীয় নাগরিক যাঁদের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁরা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। এটি ৬০ বছর বয়সে পৌঁছালে ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত একটি ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত পেনশন প্রদান করে।

কীভাবে আবেদন করবেন : এই স্কিমের জন্য নিবন্ধন করতে অটল পেনশন যোজনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem

লেহ থেকে শ্রীনগর যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীর ও লাদাখকে সংযুক্তকারী জোজিলা পাস এই বছরের জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা হয়েছিল। এবং তা সম্ভব হয়েছে 'বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন' (বিআরও)-এর অসামান্য কাজের ফলে। এই গিরিপথটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রদান করবে এমনকী শীতের সময়েও। এই গিরিপথটি সাধারণত ৩১ ডিসেম্বরের পরে বন্ধ হয়ে যায়। অবিরাম তুষারপাত এবং মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে তাপমাত্রার কারণে, এই অঞ্চলে যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে এবং শ্রীনগর-লেহ ও মানালি-লেহ জাতীয় সড়ক বন্ধ হওয়ার কারণে লাদাখ দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকী এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বিআরও কর্মীরা বরফ সরিয়ে জোজিলা পাস খোলা রাখার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছেন, যাতে সময়সূচি অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। যাইহোক, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার

জন্য শ্রীনগর-লেহ্ রুটে জোজিলা টানেল তৈরি করা হচ্ছে, যা প্রতি বছর ভারী তুষাপাতের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে, শ্রীনগর-লেহ সেকশনে বালতাল এবং মিনামার্গের মধ্যে জোজিলা টানেলটি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি এশিয়ার বৃহত্তম দ্বিমুখী টানেল হবে, সেই সঙ্গে ১১,৫৭৫ ফুট উচ্চতায় বিশ্বের সর্বোচ্চ টানেল হবে। একবার সম্পূর্ণ হলে, টানেলটির মাধ্যমে লেহ এবং শ্রীনগরের মধ্যে সারা বছর সংযোগ বজায় থাকবে।

ইন্টারনেট ছাড়াই এখন ডিজিটালভাবে ২০০ টাকা প্রদান করা যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ডিজিটাল অর্থনীতির কল্পনা করেছিলেন। ভিম ইউপিআই-এর মতো অ্যাপগুলি সেই স্বপ্নকে সাকার করেছে। কোভিড চলাকালীন সময়কালে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে রেকর্ড লেনদেনও প্রমাণ করেছে যে এটি আজকের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) এখন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরবিআই একটি কাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে মোট ২০০০ টাকার সাপেক্ষে প্রতি লেনদেন যার জন্য ইন্টারনেট বা টেলিকম সংযোগের প্রয়োজন নেই। অফলাইন মোডের অধীনে, কার্ড, ওয়ালেট এবং মোবাইলের মতো যে কোনো চ্যানেল বা উপকরণ ব্যবহার (প্রক্সিমিটি মোড) করা যেতে পারে।

কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোভিডের সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকার একটি নকশা প্রস্তুত করেছিল। এখন সরকার ধীরে ধীরে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বনির্ভর স্বাস্থ্যকর ভারত গঠনের অংশ হিসাবে উত্তরপ্রদেশে নয়টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরাখণ্ডে মেডিক্যাল কলেজ এবং গোরক্ষপুরে এমস চালু করার পর, সরকার এখন পশ্চিমবঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসার জন্য শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্প্রতি কলকাতায় চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন।

● চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রচুর রোগীর ভিড় হতো। স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতাল সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেই লক্ষ্য পূরণ করবে।

● এই ক্যাম্পাসটি ৫৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে ৪০০ কোটি টাকা এবং বাকি অংশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

● ৪৬০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যানসার কেন্দ্রে ক্যানসার নির্ণয়, পর্যায় নির্ধারণ, চিকিৎসা এবং যত্নের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।

● এখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিন (পিইটি), ৩.০ টেসলা এমআরআই, ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যানার, রেডিয়োনিউক্লাইড থেরাপি ইউনিট এবং অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

● ক্যাম্পাসটি একটি উন্নত ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে এবং সারা দেশের, বিশেষ করে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্যানসার রোগীদের ব্যাপক যত্ন প্রদান করবে।

বিদ্যাজ্যোতি স্কুল প্রকল্পের মিশন ১০০

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো উন্নত সুবিধা এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান একশোটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে বিদ্যাজোতি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা, যাতে রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নত হয়।

নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১.২ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার জন্য আগামী তিন বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনারপ্রকল্পটি প্রতিটি পরিবারের জন্য কার্যকরী শৌচাগার, আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা, বিমার প্রাপ্যতা, কিষান ক্রেডিট কার্ড, রাস্তা এবং কলের জলের প্রচার করবে, যা গ্রামের মানুষদের মনে আস্থা বৃদ্ধি করবে।

ত্রিপুরায় হীরা মডেলের বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ত্রিপুরায় যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য বর্তমান কেন্দ্র সরকার হিরা মডেল গ্রহণ করেছে, যেখানে হাইওয়ের জন্য এইচ, ইন্টারনেটের জন্য আই, সড়কপথের জন্য আর এবং এয়ারওয়েজের জন্য এ ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, 'আমি ত্রিপুরার জনগণকে হিরার আশ্বাস দিয়েছিলাম। আজ, ত্রিপুরায় হিরা মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল বিল্ডিং উন্মোচন করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের প্রকল্প মিশন ১০০-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসুচিগুলির ঘোষণা করেছেন।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৩।।